বহুবর্ণের গদ্যমালিকা

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
স্মৃতি বিস্মৃতির দোলাচলে	৪
সারপ্রাইজ	৯
পরলোকের পরোপকারী	১১
ক্লান্ত সন্ধ্যার রোমন্থন	১৪
অথ প্রতিমা উবাচ (রম্য রচনা)	১৬
বিনিসুতোর সম্পর্ক	১৯
ব্যাঁঘাত	২১
পলায়ন	২২
ম্যাজিক	২৫
সিলেক্টেড	২৭
প্রপোজ	৩০
নষ্ট দাম্পত্য	৩২
সোহিনীর অসহায়তা	৩৬
ইষ্টশক্তি	৪২
পয়মন্ত	৪৭
রসনার রসে	৫১
সোলমেট	৫২
অপেক্ষা অবসান	৫৬
আনন্দ দিন	৫৮
ক্ষনিত্র কথন (খুন্তি)	৬২
হেমন্ত রাগ	৬৪
ইষ্টকৃপা	৬৮
অরুনিমার অপেক্ষা	৭০
আহ্লাদী	৭২
রাগালাপ	৭৫
ফিরে পাওয়া	৭৯
নিয়মভঙ্গ	৮৩
বঞ্চিতের অতৃপ্তি	৮৫
ওগো আমার প্রিয়	৮৭
ভবিষ্যৎ কর্ণধার	৯১

BANGLADARSHAN.COM

॥স্মৃতি বিস্মৃতির দোলাচলে॥

ছোটছেলে মানুটার মাথার চুল দেওয়ার মানসিক ছিল জগন্নাথ বাবুর কাশীতে, সেই উপলক্ষে এবারে তিনি সপরিবারে কাশীতে এসেছেন মানসিক শোধ করতে, উঠেছেন ভোলাগিরি ধর্মশালায়। চিত্তরঞ্জনের বাসিন্দা জগন্নাথবাবুর এটি তৃতীয় সন্তান, বড়ো জগমোহন বা জগু, মেজ ছিল মনমোহন বা মনো আর এই ছোটটি মানসমোহন বা মানু। বড়ো ছেলে জগু এখন পনেরো বছরের, মেজ মনো থাকলে হত দশ আর এই ছোট মানু পাঁচ বছরের।

জগুর যখন আট আর মনোর তিন তখন জগন্নাথ গেছিলেন হরিদ্বারে সপরিবারে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কুম্ভস্নানে। জগু আর মনো দুজনেই বিভাদেবীকে “ঠাম” বলে আর সুদীপ্তাকে মা। জগুর তত্ত্বাবধানে মনোকে রেখে বৃদ্ধা মাকে কুম্ভমেলায় মহযোগের শাহী স্নান করাতে নেমেছিলেন জগন্নাথ আর সুদীপ্তা। স্নান সেরে “হর কি পৌড়ি” ঘাটেতে ফিরে দেখেন জগু একা বসে আছে, মনো নেই। বহু খুঁজেও পেলেন না তাঁরা মনোকে, খালিগায়ে একখানি ইজের পড়ানো ছিল মনোর, সদ্য দুই ছেলেকে স্নান করিয়ে বসিয়ে রেখে দিয়ে গেছিলেন নিজেরা স্নানে যাবার আগে। মনোর পাঁজরের ওপরে একটা জরুল আর পিঠের কোমরের ওপরে একটা নীলচে আঁচিল ছিল তার জন্মাবধি জন্মদাগ। সুদীপ্তা পাগলের মত দুমাস ধরে খুঁজেছিল হরিদ্বারের ঘাটে ঘাটে মনোকে কিন্তু মনোকে পাওয়া যায়নি। সেদিন ঠেলাঠেলিতে কিছু লোকজন গঙ্গায় ডুবেও মারা গেছিল, জগন্নাথ ধরে নিয়েছেন মনো তাদের সঙ্গেই অনবধানে ডুবে গেছে গঙ্গায় যদিও তার লাশ মেলেনি।

তার কয়েকবছর পরে মানুর জন্ম, জগন্নাথের মা বিভাদেবীর ধারণা মনোই আবার এসেছে। মানুর চুল তাই মানসিক করা ছিল বাবা বিশ্বনাথের দরবারে। কাশীতে এসে সংকটমোচন হনুমানজীর দর্শন করলেন তাঁরা। পরেরদিন সেই চুল দিয়ে মানসিক শোধ করে বিভাদেবী আর দুই ছেলেকে ধর্মশালায় রেখে এলেন জগন্নাথ, তারপরে আবার গেলেন মা অন্নপূর্ণা দর্শনে। মা অন্নপূর্ণা দর্শন করে ফেরার সময় ধর্মশালায় ফিরে হঠাৎ দেখেন একটা হনুমানের হাতে তাঁর মানু যার হাতে ধরা দুটো মর্তমান কলা আর একটি বছর দশেকের সাদা ধুতি পরা ছেলে ছুটছে সেই হনুমানের পেছনে ধর্মশালার বারান্দা বরাবর আর ছেলেটি মানুকে ইশারায় বলছে হাতে ধরা কলাটা ফেলে দিতে আর মানু প্রবল আতঙ্কে কান্না জুড়ে দিয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন জগন্নাথ আর সুদীপ্তা নীচের উঠোনে রুদ্ধশ্বাসে। হঠাৎ সেই ছেলেটি কোথা থেকে একছড়া কলা এনে হনুমানটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলো। হনুমানটা মানুকে নামিয়ে দিল রেলিঙ্গের ওপরে একেবারে কার্নিশ ঘেঁষে, দিয়ে লাফ দিল ওই ছেলেটার হাতে ধরা কলার ছড়াটার জন্য। মুহূর্তে ছেলেটা লাফ দিয়ে প্রায় নিজে পড়ে যেতে যেতে ধরল গিয়ে মানুকে নিজের শরীরে চেপে আর কলার ছড়াটা হনুমানটাকে দিয়ে দিল। ততক্ষনে গোটা

ধর্মশালার লোক জড়ো হয়ে গেছে রুদ্ধশ্বাসে কি হয় দেখতে ধর্মশালার উঠোনে। মানুকে কোলে নিয়ে সেই ছেলে ছুটল জগন্নাথদের দোতলার ঘরের দিকে।

জগন্নাথ আর সুদীপ্তাও গিয়ে উপস্থিত হলেন ঘরে, মানুকে ফিরে পেয়ে বিভাদেবী আর জগুও কাঁদছে। এমনিতেই মনোর ওই হারিয়ে যাওয়া নিয়ে জগুর মনে একটা দুঃখ আছে যে ওর জিম্মার থেকেই ভাই হারিয়ে গেছে, তাই এবারে মানুকে ফিরে পেয়ে সে কি করবে বুঝতে পারছে না।

হৈচৈ শুনে ভোলাগিরি আশ্রমের সুনীল মহারাজও এসে উপস্থিত হয়েছেন। হঠাৎ সুদীপ্তার চোখ পড়লো ওই সাদা কাপড় পরা খালি গায়ে দাঁড়ানো ছেলেটার দিকে, তার পাঁজরের নিচে একটা জরুল আর মুখটা অবিকল মনোর মত, যদিও এই কয়েক বছরে বেশ একটু পাল্টেছে। কৃতজ্ঞতায় ওকে বুকের মধ্যে টেনে নেওয়ার সময় সুদীপ্তার নজর পড়লো ওর পিঠের কোমরের দিকে। ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখলেন সেই নীলচে আঁচিল।

সুনীল মহারাজকে সুদীপ্তা জিজ্ঞেস করলেন ওই ছেলেটি সম্পর্কে, বলতে ভুললেন না যে তাঁদের মেজপুত্র মনোমোহন না মনো হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় কিভাবে হারিয়ে গেছে। অফিসঘরে বসে ক্রমে সুনীল মহারাজের কাছে জানতে পারলেন ওর নাম মনু। ওকে ভোলাগিরি আশ্রমের তৃষান মহারাজ হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় হরিদ্বারেরই ভোলাগিরি ধর্মশালার চত্বরে অচেতন অবস্থায় পান, তুলে এনে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুললেও আসল নাম, বাড়ি কিছুই বলতে পারেনি। সেই থেকে মনু এখানেই আছে, শাস্ত্রচর্চা, শরীরচর্চা করে, অসম্ভব কর্মঠ, ভোলাগিরি ধর্মশালা তো বটেই ভোলাগিরি আশ্রমের সন্ন্যাসীদের সে বড়ো প্রিয়পাত্র, ভীষণ নিঃস্বার্থ আর পরোপকারী ছেলে। মনুকে ডেকে নিয়ে জগন্নাথদের ঘরে গেলেন সুনীল মহারাজ। এবারে মনুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সুদীপ্তা বলল, “দেখো তো বাবা, আমাদের কাউকে তোমার চেনা লাগে কিনা ছেলেটি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সুনীল মহারাজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল,” পরে তাকিয়ে থেকে শেষে বিভাদেবীর কাছে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল "ঠাম", তারপরে সুদীপ্তাকে ডাকল ।তবু আরো নিশ্চিত হবার জন্য এরপরে " মা" সুনীল মহারাজ আর তৃষাণ মহারাজ এলেন ওদের চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে, সেখানে মনোর ছোটবেলার ছবি দেখে আর ডিএনএ টেস্ট করিয়ে জগন্নাথ আর সুদীপ্তার সঙ্গে নিশ্চিত হলেন যে মনু আসলে মনোমোহন, যে তিন বছর বয়সে মনু আর মনোকে একই ভেবে সাড়া দিয়ে গেছে আশ্রমে।

কিন্তু সে এক অদ্ভুত জেদ ধরল জগন্নাথ আর সুদীপ্তার কাছে, সে তার পড়াশোনাটা ভোলাগিরি আশ্রমে থেকেই করতে চায়, আসলে সে ওই সাত্ত্বিক ত্যাগের ব্রহ্মচর্যের আশ্রম জীবনটা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিল না, ওখানকার মহারাজদের সঙ্গে এই কয়েকবছরে তার গড়ে উঠেছে আত্মিক যোগ। জগন্নাথ মহারাজদের সঙ্গে কথা বলে ওকে ভর্তি করে দিলেন ভোলাগিরি আশ্রমের স্কুলে দেওঘরে, ও ওখানে ভীষনই ভালো থাকত,

এতটাই ভালো যে ছুটিছাটাতেও বাড়িতে আসতে চাইত না খুব প্রয়োজন না পড়লে। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতেন মা বাবা, তবু তো তাঁরা জানতে পারছেন সে আছে কাছেপিঠেই। আশ্রমে থেকে পড়াশোনা শেষে সে ঝাড়খন্ডের ইলেকট্রিক সাপ্লাই বোর্ডে ভালো চাকরি পেল, বিয়ে দিলেন তার জগন্নাথ আর সুদীপ্তা। সংসারী হল বটে মনো ঠিকই কিন্তু গোদা বৈষয়িক ব্যাপার তার ভালো লাগে না, সাংসারিক কূটকচালি অপছন্দ তার। ভীষণ চুপচাপ, অন্তর্মুখী স্বভাব তার। আস্তে আস্তে বিভাদেবী আর জগন্নাথ মারা গেলেন, পঁচাত্তোরের সুদীপ্তা থাকেন এখন ঘাটশিলায় মনো আর তার পরিবারের সঙ্গে।

****

বেশ কিছু বছর পরের ঘটনামনোমোহন এবার প্রয়াগে কুম্ভমেলায় সপরিবারে স্নানে এসেছেন.....।
মনোমোহনের এখন বছর পঞ্চাশেক বয়স, একটু অসুস্থই ছিলেন তিনি, সঙ্গে স্ত্রী সুপর্ণা আছেন, জননী সুদীপ্তা আছেন, যুবক পুত্র অর্পণ আছে। এবারে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ স্নান, অস্বাভাবিক ভীড় হয়েছে, ভীষণ কোলাহল। ঠিক স্নান সেরে ফেরবার সময়ে হঠাৎ দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মিছিল শুরু হল ঘোড়া, হাতি, শিঙ্গা, নাকাড়া, ঝাঁঝর, খোল, করতাল বাজিয়ে সারি দিয়ে এবং সাধারণ পুণ্যার্থীদের মধ্যে প্রচন্ড হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ওই সন্ন্যাসীদের মিছিল থেকে দূরে সরে যাবার জন্য। এঁদের মিছিল বহুক্ষণ ধরে চলে আর তখন সাধারণের যাতায়াত বন্ধ থাকে।

মনোমোহন তাঁর পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন ভীড়ের একটা দিকে আর পরিবার রয়ে গেল আরেকদিকে। মনোমোহন ভীড়ের ধাক্কায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন এবং তাঁর ওপর দিয়ে লোক দৌড়োতে থাকল তাঁকে পদপিষ্ঠ করে দিয়ে। মনোমোহন একে অসুস্থ ছিলেন, তারওপর এই ভীড়ের চাপ এবং অসংখ্য মানুষের পায়ের তলায় পিষ্ট হবার যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইলেন ঘন্টা দুয়েক। এদিকে পরিবারের লোকজন তাঁকে খুঁজতে থাকে, ভীড় কমলে আর সন্ন্যাসীদের মিছিল চলে গেলে প্রথমে তাঁর স্ত্রী সুপর্ণা ও পরে পুত্র অর্পণ দেখল তিনি ঐভাবে বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ সেখানকার স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্যে তাঁকে ধরাধরি করে তুলে তাঁর পরিবার তাঁদের তাঁবুতে নিয়ে এলো।

মনোমোহনের জ্ঞান ফেরার পরে একটু সুস্থ হলে তিনি বেশ কিছুক্ষন ধরে সংস্কৃতশ্লোক বলতে থাকলেন। যেমন.....
“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদা আত্মনম্ সৃজামি অহম্ ॥৭”

অর্থহে ভরত যখনই ধর্মের অধঃপতন হয়এবং অধর্মের অভূত্থান হয় তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করে-অবতির্ন হই।

“পরিত্রানায় সাধুনাম বিনাশায়ঃ চ দুস্কৃতম্ ।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে॥৮
অর্থসধুদের পরিত্রান করা-র জন্য এবং দুস্কৃত কারিদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতির্ন হই।”

একটু ধাতস্থ হবার পরে তাঁর স্ত্রী জানতে চাইলেন তিনি হঠাৎ সংস্কৃত শ্লোক বলছেন কেন? সুপর্ণা যারপরনাই আশ্চর্য হয়েছেন কারণ মনোমোহন যে আদৌ সংস্কৃত জানেন তা তাঁর স্ত্রীর অজ্ঞাত। এমনিতেই মনোমোহন ভীষণ আপনভোলা, অন্তর্মুখী, মিতবাক মানুষ, সে এমন শ্লোক বলছে হঠাৎ আশ্চর্য সুপর্ণা তাই ভীষণ !!!! বিপর্যস্ত হয়ে মনোমোহনকেই জিজ্ঞেস করলেন,তখন মনোমোহন বললেন যে ছোটবেলায় পাঁচ বছর বয়স থেকে তিনি টানা আট বছর প্রত্যেকদিন সংস্কৃত পন্ডিতমশাইয়ের কাছে গীতাপাঠ করতেন ভোলাগিরি আশ্রমের স্কুলে পড়বার সময় এবং পরেরদিন সেটার পড়া দিতে হতো পন্ডিতমশাইকে। ফলে গীতা তাঁর মননে, ধ্যানে, চেতনে গেঁথে গিয়েছিল। বলে আবার বলতে লাগলেন এই শ্লোকগুলো :

BANGLADARSHAN.COM

“ব্রহ্ম অর্পনম্ ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্ম অগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্ম এব তেন গন্তব্যম্ ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা॥২৪"
অর্থযিনি কৃষ্ণ ভাবনায় সম্পুর্ন মগ্ন তিনি অবশ্যই চিৎজগতে উন্নিত হবেন-,কারন তার সমস্ত কার্য কলাপ চিন্ময়। তার কর্মের উদ্দেশ্য চিন্ময় এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যা নিবেদন করেন তাও চিন্ময়।

“শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযত ইন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানম্ লব্ধা পরাম্ শান্তিম্ অচিরেন অধিগচ্ছতি॥৩৯"
অর্থসংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এইজ্ঞান লাভ করেন-,সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরাশান্তি লাভ হন।

কিন্তু তারপরে বহুদিন তাঁর নানাবিধ কারণে গীতাপাঠে ছেদ পড়ে যায়, তিনি পড়াশোনা শেষ করে প্রথমে চাকরিজীবনে ও পরে সংসারজীবনে প্রবেশ করেন।

যখন ঐ ভীড়ের চাপে তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছিলেন, তখন তিনি দেখেছেন তিনি একটি নদীর বালুকাময়

তটে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর বেশ কিছু গাছের পাতা উড়ে উড়ে তাঁর চারিদিকে যেন ঘুরছে। তিনি আস্তে আস্তে একটি দুটি পাতা হাত দিয়ে ধরতে থাকেন, ধরে দেখেন সেগুলির প্রতিটিতেই ওপরে উক্ত একটি করে গীতার শ্লোক লেখা রয়েছে, সেগুলি তিনি একটি করে ধরতে থাকেন আর বলতে থাকেন, বেশ কিছুক্ষন এইভাবে করার পরে তিনি অনুভব করেন তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং তিনি পরিবারের মধ্যে আবার ফিরে এসেছেন। সেইদিন থেকে মনোমোহন আবার গীতাপাঠ শুরু করলেন। একদা নিয়মিত পঠিত পাঠ্য যা বহুদিন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল তা যে এইভাবে মননে, ধ্যানে, চেতনে গেঁথে গিয়ে তাঁকে জীবনমৃত্যুর মাঝে দাঁড় করিয়ে আবার জীবনের মোক্ষপ্রাপ্তির সন্ধান দিয়ে দিশা দেখাবে সেটা তিনিও ভাবেন নি।তাই গীতার অষ্টাদশ পর্বের ৬৬ নম্বর শ্লোকে বলেছে -

“সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"
অহম ত্বাং সর্ব পাপেভ্য মোক্ষামি স্বামী মা শূচঃ॥”

যাতে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, অর্থ হে পার্থ" -, সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাপন্ন হও। আমি সকল প্রকার পাপ হতে তোমায় রক্ষা করব, তুমি শোক করো না।”

সকল জীবকে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এটাই মুক্তির পথ। মোক্ষ যোগের অন্তিম চরণ।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীভগবানের এই কৃপা ধরে রেখে জীবনের চলার পথে বাকী জীবনটা তিনি কাটিয়ে দেবেন ঠিক করলেন এবং সেই কৃপার পরশে তাঁর বিস্মৃতি মুছে গিয়ে স্মৃতির দরজা উন্মুক্ত হল। শুধু মনোমোহনের জীবন থেকে হারিয়ে গেল তাঁর আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে কাটানো সাত্ত্বিক ত্যাগের জীবনটা যা তাঁর বোধকে এক অনন্য প্রজ্ঞায় উন্মোচিত করেছে, তাঁকে করেছে সংসারবিমুখ কিন্তু সংসার জীবনের সঙ্গে পুনঃসংযোগের জন্য সে বেরিয়ে যেতে পারেনি ঘর ছেড়ে সেবার ব্রত নিয়ে, মনে আক্ষেপ আছে তাঁর মানুষের মাঝে নেমে মানুষের জন্য কাজ করার সেই উদ্দেশ্য হারিয়ে গেল সংসারে ঢুকে তবু সংসার আশ্রমকে ভরসা করেই বাকী তিন .... আশ্রম, ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস দাঁড়িয়ে আছে এটুকুই তাঁর সান্ত্বনা মনে হয়, যদিও এখনকার সমাজজীবনে এগুলোর দাম নেই, আগ্রাসী সংসারী হওয়াটাই উপজীব্য এখন, শান্তির গৃহস্থ জীবন নয়, বৈভবের দিকেই সবাই ছুটছে যেটা তাঁকে আরো বিমুখ করে। জীবনের এই সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়ে মনে হয় মা যদি সেদিন কাশীতে তাঁকে চিনতে না পারতো তাঁর হারিয়ে যাওয়াটা একটা সার্থক জীবন হত হয়তো!!!

॥সারপ্রাইজ॥

ঠাকুরঘরে সন্ধে দিয়ে ছাদে গেল অপর্ণা গাছে জল দিতে। ছাদে তার নিজের হাতে তৈরী একটা ছোট্ট বাগান আছে টবে গাছ বসিয়ে। সেগুলোর দিনান্তে দেখা শোনা সেই করে, যদিও সে চাকরি করে কিন্তু সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ঢুকে যায় সে অফিস থেকে। একটা স্কুলের প্রশাসনিক বিভাগে সে কর্মরতা। শাশুড়ি, স্বামী আর ছেলে নিয়ে সংসার তার, কিছুদিন আগে শ্বশুরমশাই মারা গেছেন। উফঃ...ভাগ্যিস গেছেন। নাহলে যে কি করত সে।

ছাদে উঠে আকাশের দিকে চেয়ে তার জলসিঞ্চন থেমে গেল। তাদের বাড়িটা এমন জায়গায় যেখান থেকে কাছেই নদীটা চোখে পড়ে, সেই নদীর জলকে আবির রাঙা করে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে নানান কলকাকলিতে মুখরিত করে পাখিরা বাসায় ফিরছে ঝাঁকে ঝাঁকে। পাটে বসা সূর্যের অপরূপ লালিমাতে সারা চরাচর জুড়ে ছড়িয়ে আছে এক অপার্থিব নরম আলতো আলো। দূরে দূরে বাড়িগুলোর মাথার ওপরে জ্বলে উঠছে একটা একটা করে আকাশ প্রদীপ। আশে পাশের বাড়িগুলো থেকে সন্ধ্যার শঙ্খ ধ্বনি ভেসে আসছে। নদীর ওপারে ডিঙি নৌকোগুলো একে একে ঘাটে ভিড়ছে, তীরে দাঁড়ানো বড়ো নৌকোর ভেতরে অস্পষ্ট আলো জ্বলে উঠছে। আস্তে আস্তে ঘন মসীলিপ্ত হয়ে রাত্রির আগমনীর সূচনা হচ্ছে। কার বাড়ি থেকে ভেসে আসছে বহুশ্রুত প্রিয় গানের কলি, “নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়,কুলায় যেতে কি যেন কাকলি, আমায় দিয়ে যেতে চায়।”

অপর্ণা ভাবছে গত বছর পর্যন্ত কি দুর্বিসহ গেছে তার পুজো আর ছুটির দিনগুলো। যৌবনের শুরুতেই মাতৃহারা সে মা মারা যাবার পরে বাবার অত্যাচারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তখন সে চাকরি করে, অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখত বাবা গ্যাসের নব খুলে রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেছে পাছে সে গ্যাস জ্বালিয়ে কিছু করে খায়, ঘরের আলো জ্বালালে বা টিভি চালালে বাবা এসে নিবিয়ে দিত কারেন্ট পুড়ছে বলে, এদিকে মাস গেলে বাবাকে হাতে বেশ কিছু টাকা তুলে দিতে হত ওই বাড়িতে আছে বলে। রাত্রে বেশিরভাগ দিন খেত চপ মুড়ি, এমন সময় অশান্তি করে মেরে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল বাবা। দিদিকে বলতে দিদি সঙ্গে সঙ্গে ওকে বলল দিদির কাছে চলে যেতে। দিদি, জামাইবাবু বেশ কিছুদিন ওকে ওখানে রেখে দেখে শুনে বিয়ে দিল এই বাড়িতে। দুই ভাই, ওর বর বড়ো ছেলে, ছোটো ভাই আমেরিকাতে থাকে, সে বিবাহিত। বাড়িতে লোক বলতে ওর স্বামী, শ্বশুর আর শাশুড়ি। নিজেদের মার্বেলে মোড়া দোতলা বাড়ি, নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার, ননদের ঝামেলা নেই, স্বামী চাকরি করে, শ্বশুর সরকারি চাকরি করে অবসর নিয়েছেন। দিদি জামাইবাবু কুষ্ঠি মিলিয়ে খোঁজ নিয়েই বিয়ে দিলেন। কিন্তু হিসেবে গড়মিলটা অপর্ণা টের পেল বিয়ের পরে, বাড়িতে বাবা, ছেলেরা সময় সময় ছেলেদের মা পাঁড় মাতাল আর মদ ওদের খাচ্ছে এখন, ফলে ওদের মানসিক স্থিরতা ভীষণ টলমললো। পেটে দুপাত্তর পড়লে বাপ, ছেলে সব কি যে করে আর কি যে বলে তার কোনো ঠিক নেই। কথা না বললে সেই সময় তাদের মনে হয় তাদের অগ্রাহ্য করছে লোকে। অবর্ণনীয়, দুঃসহ, ক্লান্তিকর এবং অসহ্য সময় কেটেছে অপর্ণার গত বছর পর্যন্ত। প্রতিপদে মনে হয়েছে আত্মহনন করে, ছেলের জন্য পারেনি। ছেলের

পড়াশোনা, স্কুলের খরচ, সব কিছুর দায় অপর্ণার, বরের কোনো দায় নেই।শাশুড়ির সামনে আবার তার ছেলেকে কিছু বলা যাবে না, ছেলের নাকি মনে লাগবে। অবস্থা এমন জায়গায় গেছিল যে পুলিশের দ্বারস্থ পর্যন্ত হতে হয়েছিল।গতবছর সেই শ্বশুর হার্টের সমস্যাতে মারা গেল। তারপর থেকে অপর্ণা একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলেছে।

এবারে যদিও লকডাউন, করোনার আবহ কিন্তু বাড়িতে অন্তত শান্তিতে থাকতে পারছে। বর মদের গেলাস নিয়ে বসলেও তার পৃষ্ঠবলটা নেই, তাই অনেকটাই ম্রিয়মান সে। বাড়াবাড়ি করার আগে দুবার ভাবতে হয় বরকে। হঠাৎ অপর্ণার কানে ভেসে এলো খুব পরিচিত প্রিয় কয়েকটা গলা নীচের থেকে, তাড়াতাড়ি ছাদের দরজা লাগিয়ে নিচে নেমে দেখল অপর্ণার দিদি, জামাইবাবু এসেছে আজ ওকে সারপ্রাইজ দিতে। ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে দিদিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল।

॥পরলোকের পরোপকারী॥

আজ একমাস হল দীপ্ত আর সুনিধি এসেছে ভাড়া নিয়ে দেওঘরের এই এক তলা বাড়িটাতে। দীপ্ত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মী, সদ্য ছমাস হল বিয়ে করেছে। এম এ পাশ সুনিধির রান্না করা, বাগান করাটা ভীষণ ভালোবাসার জায়গা। বাম্পাস টাউনের এই বাড়িটায় তিনটে শোবার ঘর, একটা বসার ঘর, একটা ডাইনিং হল, একটা রান্নাঘর, দুটো বাথরুম আর দুদিকে দুটো ঢাকা গ্রিল দেওয়া বারান্দা। গোটা বাড়িটা বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা, বাউন্ডারির ভেতরে সামনের দিকে বেশ কিছু ফুলের গাছ নিয়ে কেয়ারী করা বাগান, পেছনের দিকে বেশ কিছু ফলের গাছ আর একটা শিউলিফুলের আর একটা স্বর্ণচাঁপার গাছ আছে। বাইরে একটা বাঁধানো কুঁয়ো আছে ঢাকা দেওয়া, যার দড়ি বালতি নামানোই থাকে সবসময়। ওখান থেকেই বাগানের গাছে জল দেওয়া হয়। বাড়ির মালিক ভদ্রলোক সুনীলবাবু বেশ সৌখিন মানুষ, বাগানে একটা দোলনা টাঙ্গানো আছে এবং সমস্ত বাগানসহ বাড়িটা একদম সুন্দর করে সাজানো।

দীপ্ত অফিসে বেরিয়ে গেলে সারাদিন বাগানের পরিচর্যা আর নানা রকমারি রান্না করে দিন কেটে যায় সুনিধির। ওকে হাতে হাতে সাহায্য করে দেয় স্থানীয় আদিবাসী মেয়ে ঝুমরি। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে সে খেয়াল করছে হঠাৎ হঠাৎ যেন কেউ সরে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে, রান্না করতে করতে মনে হচ্ছে কেউ ওকে যেন লক্ষ্য করছে, কিন্তু ঘাড় ঘোরালে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। মাছ বা বড়া ভেজে রাখলে যেন কয়েকটা কম কম ঠেকছে, একজন তৃতীয় কারুর উপস্থিতি সুনিধি টের পাচ্ছে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

সেদিন দুপুরে ঘর গোছাতে গোছাতে ওর মনে হল কেউ যেন বাইরের বাগানের দোলনাটাতে দোল খাচ্ছে। ও তড়িঘড়ি বাইরে গিয়ে দেখল দোলনাটা তখনো দুলছে কিন্তু কেউ কোথাও নেই। ঘরে এসে দরজা লাগিয়ে রান্নাঘরে গেল। আগেরদিন দীপ্ত তোপসে মাছ এনেছে অনেকটাই, ও ভাবল তোপসের ফ্রাই ভাজবে। সব কিছু জোগাড় করে ও দেখল ব্যাটারটায় নুনটা দেওয়া হয়নি, ও হাতটা ধুয়ে নুন দেবে বলে হাতটা ব্যাটার থেকে সবে তুলেছে, দেখল মাপমতো নুন এসে পড়ল ওর ব্যাটারটায়। ও এদিক সেদিক দেখে কাউকে দেখতে পেল না, ও খুবই বিরক্ত হল। আরেকদিন দুধ বসিয়ে চাল ধুচ্ছিল সুনিধি বাইরের কলে, ভুলেই গেছিল দুধটা বসানো আছে। যখন মনে পড়ল কিছুক্ষন পরে, তাড়াতাড়ি এসে দেখল দুধের গ্যাসবার্নারটা নেভানো, একটুও দুধ পড়েনি উথলে, কিন্তু দুধটা ফুটে গিয়ে ধোঁয়া উঠছে। রোজ স্নান সেরে গাছের গোড়ায় জল ঢালা ওর ছোটবেলার অভ্যেস, এখানেও সেটা করে ও, সেদিন জল ঢেলে ফেরার সময় মনে হল কেউ যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল ও জল দেওয়ার পরে। সুনিধি বাগানের ফলের গাছগুলোর নিচে গিয়ে দাঁড়ালে আপনার আপনি কিছু ফল ওর পাশে এসে পড়ে। ফুল তোলার সময় উঁচু ডালের ফুলগুলো যেন কেউ ওর নাগালে ধরিয়ে দেয়। ও ঝুমরিকে জিজ্ঞেস করেছে এই ব্যাপারে কিছু জানে কিনা, ঝুমরি কিছু বলেনি, শুধু হেসেছে। এইভাবেই চলছিল, চোখে দেখে না কিছু, ক্ষতিও করেনা অথচ সে আছে। অপকারী প্রেত হিসেবে নয়, উপকারী বন্ধু হিসেবে, ভীতিপ্রদ নয়, বরং কিছু ক্ষেত্রে প্রীতিপ্রদ।

এর মধ্যে ঋতু পরিবর্তনের কারণে ঠান্ডা লেগে সুনিধি জ্বরে পড়ল, দীপ্ত হরলিক্স করে বিস্কুট দিয়ে ওকে খাইয়ে প্যারাসিটামল খাইয়ে অফিসে চলে গেল। সুনিধি ঘুমিয়ে পড়ল, ঝুমরি কাজ সেরে ওকে ঘুমন্ত দেখে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল। এদিকে কিছুক্ষন পরে সুনিধির ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, আবার জ্বরও এসেছে ওর, মাথা তুলে বসতে পারছে না। ঘরের মধ্যেই জলের বোতলগুলো আছে কিন্তু সুনিধির ওঠার ক্ষমতা শরীরে নেই। ও জলের জন্য হাত বাড়াতে দেখল বোতলটা যেন হাওয়ায় ভেসে ওর নাগালের মধ্যে চলে এল। ও জল খেয়ে একটু স্বস্তি পেল, উঠে গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে আবার শুয়ে পড়ল। তারপর জ্বরের তাড়সে একদম বেহুঁশ হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষন পরে যখন হুঁশ ফিরল দেখল কেউ একজন ওর মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে, ধড়মড় করে উঠতে গেল, সেই জলপট্টি দেওয়া ঠান্ডা হাত ওকে শুইয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, “আমি মালতি, এই বাড়িতে থাকি, কিছু বছর আগে আমাকে মেরে পুঁতে দিয়েছিল কিছু লোক, সেই থেকে আর মুক্তি পাইনি। তুমি ভয় পেও না আমাকে, আমি তোমার শুভাকাঙ্খী, শুধু রোজ একটু করে খেতে দিও আমাকে।” সুনিধি হাসল শুয়ে শুয়ে, ওর জ্বর নেমে গেছে নতুন বন্ধু মালতির সেবায়। পরলোক বাসি আত্মা হয়েও সে নরলোকের দম্পতির উপকারী বন্ধু হয়ে যায়।

এরপরে দীপ্ত না থাকলেই মালতি আসে। সুনিধি আস্তে আস্তে জেনেছে মালতির মুখে, তাদের বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক সুনীলবাবুর মালতির বর রাকেশের সঙ্গে ব্যবসার টাকা সংক্রান্ত ঝামেলা হয়েছিল। মালতির বর রাকেশ টাকা ফেরত দিতে না পারার জেরে সুনীলবাবু টাকা উদ্ধার করতে লোক লাগান মালতির বরকে মারতে। কিন্তু মালতির বর রাকেশ জানতে পেরে পালায় আর সেই লোকজন মালতিকে খুন করে এই বাড়ির বাগানের জমিতে পুঁতে দেয় মালতির লাশ গুম করে। মালতির বর রাকেশ আর ফেরেনি আর মালতির দেহের যেহেতু পারলৌকিক কাজ হয়নি, তাই মালতির আত্মা আজও মুক্তি পায়নি। সুনীলবাবু এই বাড়িতেই থাকতেন পরিবার সমেত, কিন্তু তাঁর পরিবার ভূতের উপদ্রবে নতুন বাড়ি কিনে অন্য জায়গায় উঠে যান। বাড়িতে বাস না করলে কেউ জানতেও পারেনা মালতির উপস্থিতি।

সুনিধি এখন যা কিছু খাবার বানায়, সেটা চারজনের, ওর নিজের, দীপ্তর, ঝুমরির আর মালতির। মালতির খাবার রান্নাঘরেই রাখা থাকে, সে নিয়ে নেয়। ভূত হলেও সে সুনিধির বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে। এরমধ্যে দুবার দুবার দীপ্তর আসন্ন বিপদ থেকে সে বাঁচিয়েছে দীপ্তকে। একবার দীপ্তর স্কুটারের ব্রেকের তার খুলে গেছিল, সেদিন দীপ্ত স্কুটারে উঠতে যেতেই মালতি স্কুটারটা উল্টে দিয়েছিল। আরেকদিন প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে দীপ্ত বাড়ি ফিরছিল স্কুটারে, ঝড়ের তান্ডবে গাছ ভেঙে দীপ্তর মাথায় পড়ার আগেই সে আটকে দিয়েছিল গাছটার দীপ্তর ঘাড়ে পড়া, দীপ্ত যখন সুনিধিকে এসে সবিস্তারে বলছে ঘটনাটা, তখন মালতি দীপ্তর দৃষ্টির বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে মৃদু মৃদু। এমন পরলোকের বন্ধুর বন্ধুত্ব তাই সুনিধিও ফেরায় না, সেও মালতিকে বন্ধু এবং বাড়ির একজনের মতোই মনে করতে থাকে কিন্তু মনের মধ্যে মালতির এই প্রেত হয়ে কষ্ট পাওয়াটা পীড়া দেয়। মালতিকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেবার রাস্তা সুনিধিও খুঁজতে থাকে। এমন সময় এক সাধু আসেন বৈদ্যনাথ মন্দিরে। বহুবছর ধরে তিনি পরিব্রাজনা করছেন এবং সিদ্ধমহাত্মা তিনি, তাঁকে সুনিধি এর প্রতিকার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলে দেন শ্রাদ্ধ করে পিন্ডদান করতে হবে। দীপ্ত মালতির ব্যাপারে জানে না কিছু এখনো।

দেখতে দেখতে দু বছর হল ওদের দেওঘরে। এমন সময়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পরে সুনিধি অন্তঃসত্ত্বা হল, দীপ্ত তাকে নিয়ে চলল কলকাতায় সুনিধির বাপের বাড়িতে। সেখানে ডাক্তার দেখানো চেকাপের জন্য সুনিধিকে রেখে সে ফিরল দেওঘরে একা। আর দীপ্ত রওনা দিতেই সুনিধি কালীঘাটে গিয়ে নিজে বসে মালতির পারলৌকিক কাজ করল সাত হাজার টাকা খরচা করে, পিন্ডদান হল মালতির নামে। সেদিন রাত্রে সুনিধি শুয়ে পড়ার পরে হঠাৎ ঘরের মধ্যে দেখল মালতি দাঁড়িয়ে, দুচোখে তার কৃতজ্ঞতার অশ্রু আর মুক্তির আনন্দ। সে সুনিধিকে অনেক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পৃথিবীর মায়া কাটাল নমস্কার করে সুনিধিকে। সুনিধির মন খারাপ হল তার সঙ্গীর চিরবিদায়ে কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তার বন্ধুর আত্মার সার্বিক শান্তি কামনা করল। সুনিধির ভালোবাসায় যে বন্ধুত্বের হাত মালতি বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের সেই ভালোবাসা এভাবেই পূর্ণতা পেল। পরে দীপ্ত সবটা শুনে খুব অবাক হল, আবার সুনিধির সহমর্মিতার খুব প্রশংসা করল, মালতির আত্মা মুক্ত হল। বাড়িটা দোষ থেকে মুক্ত হল চিরতরে।

॥ক্লান্ত সন্ধ্যার রোমন্থন॥

ক্লান্ত কার্তিকের বিকেলে দ্রুত মুছে যাচ্ছে দিনের আলো, ঘড়িতে সবে বিকেল পাঁচটা, বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসে চারদিক ঘন মসীলিপ্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। নিস্তব্ধ নির্জন নিঝুম সন্ধ্যা নামছে চরাচর জুড়ে। পরনের শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে বিমলা এসে দাঁড়ালো নীলিমাদেবীর কাছে। বিকেলের খাওয়ার বাসন মাজার কাজ সেরে সে এবার বাড়ি যাবে, নীলিমাদেবীকে বলল, "ও মাসিমা, দরজাটা দিয়ে দাও গো, আমি এলুম এখন।" নীলিমা দেবী সম্মতিসূচক মাথাটা নেড়ে এগিয়ে গেলেন একতলার সিঁড়ির দিকে, বিমলা বেরিয়ে গেল, তিনি দরজাটা লাগিয়ে গিয়ে উঠলেন ঠাকুরঘরে। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে, ধূপ দিয়ে, শঙ্খে ফুঁ দিয়ে সন্ধে দিলেন, হাতজোড় করে প্রণাম করে এগিয়ে গেলেন বাসনের সিন্দুকের দিকে। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে যে বাসনগুলো বেরিয়ে ছিল সেগুলো এখনই তুলে ফেলবেন মনস্থ করেছেন।

ধুয়ে রাখা বাসনগুলো শুকনো কাপড়ে মুছে তোলেন প্রতিবার, সেইমতো একটা শুকনো কাপড় মজুত করে রেখেছেন আগে থেকে হাতের কাছে। বাসনগুলো একটা একটা করে মুছতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ছে। নীলিমাদেবীর এটা দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথমবার বাড়ি থেকে দেখে বাইশ কাঠা জমির ওপরে বিরাট বাড়ি, বাগান, পুকুর, মন্দির সহ, তিন ভাইয়ের ছোটটির সঙ্গে মা বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন, সম্বন্ধ এনেছিল মাসতুতো দিদি। তখন তিনি সদ্য একুশে, সবে বি এ পরীক্ষা দিয়েছেন, রেজাল্টও বেরোয়নি। ছেলের কন্ট্রাক্টরির ব্যবসা, মা নেই, বাবার বয়স হয়েছে, দাদা বৌদি অভিভাবক ছেলের, বয়সে অনেকটা বড়ো ছিল নীলিমা দেবীর থেকে। দুমাস ছিলেন তিনি সেখানে, তার মধ্যে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন এক কাপড়ে। "কিছু দিতে হবেনা, কিছু লাগবেনা" বলে তারা কুড়ি ভরি সোনার গহনা নিয়েছিল, খাট বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি নিয়েছিল, টেপ রেকর্ডার, চল্লিশটা নমস্কারি শাড়ী আর প্রচুর কাঁসা পেতলের দানের বাসন নিয়েছিল। বাবা টিভি কেনার জন্য টাকাও দিয়েছিলেন কিন্তু সেই টাকা বা টিভি কোনোটাই আর নীলিমাদেবী পাননি হাতে। ডিভোর্সের সময় কিন্তু অধিকাংশ জিনিস ফেরত দেয়নি তারা। কেস চলাকালীন ওদের পক্ষের উকিল নীলিমা দেবীর বাবাকে বলেছিলেন, "আপনি কি দেখে এই বাঁদরটার গলায় এমন একটা সোনার মেয়ে তুলে দিলেন মশাই?" বাবা খুব লজ্জা পেয়েছিলেন সেদিন।

পরে নীলিমাদেবী অনেক খেটে ভালো চাকরি পান, সেখানেই আলাপ হয় আলোকিতের সাথে, তারপর বিয়ে, এক ছেলে এক মেয়ে হয়, নিজের সংসারের জন্য আর ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধা শাশুড়ির দেখা শোনার জন্য চাকরি ছেড়ে দেন তিনি টানা একুশ বছর চাকরি করার পরে। নীলিমাদেবীর মা নীলিমাদেবীর পুজো আচ্চার বাতিকের জন্য তাঁর সব পুজোর বাসন নীলিমাদেবীকে দিয়ে যান। শাশুড়ির কিছু বাসন শাশুড়ি দেন, নীলিমাদেবী নিজের শখেও অনেক বাসন কিনেছেন। সেইসব বাসন যোগ হয়ে যা দাঁড়িয়েছে তার পরিমাণ নেহাত কম নয়।

বড়ো পিলসুজটা শাশুড়ি মায়ের দেওয়া, প্রতিবার দুর্গাপুজোতে বেরোয়, এবারেও বেরিয়েছিল, বড়ো ঘটটা পাতা হয় লক্ষ্মীপুজোতে, দুটো পঞ্চপ্রদীপ আরতির জন্য, জলশঙ্খের পেতলের স্ট্যান্ড, বড়ো প্রদীপ যাতে

অনেক ঘি দিয়ে জ্বালানো হয় সেটা, বড়ো নৈবেদ্যের থালা, ভোগ নিবেদনের নারায়ণ, লক্ষ্মীর থালা বাটি, রূপোর টাট, তামার টাট নারায়ণের স্নানের, মধু নিবেদনের, পাঁচ কড়াই ভেজানোর, সব একে একে মুছে ঢোকালেন ভেতরে। এই যেমন পেতলের এই হাঁড়িটাতে মা খিচুড়ি করতেন লক্ষ্মীপুজোতে যা খেতে সারা পাড়ার লোক আসত তাঁদের বাড়িতে। হাঁড়িটা হাতে নিতে যেন সেই মায়ের হাতের খিচুড়ির সুবাস নাকে এসে লাগল নীলিমাদেবীর। ওই সিন্নি মাখার বড়ো গামলাটাতে পাঁচ কেজি আটার সিন্নি মাখতেন বাবা, কি অপূর্ব ছিল তার স্বাদ, গুড় নারকোল কোরা, কাজু, কিসমিস, পেস্তা, দুধ, বেদানার দানা, কাঁঠালি কলা দেওয়া সেই প্রসাদী সিন্নি পাড়ার লোকজন চেয়ে খেত তাদের বাড়িতে এসে। পেতলের কড়াইটা মুছতে গিয়ে মনে পড়ছে মায়ের হাতের লাবড়া, ফুলকপির তরকারি আর বাঁধাকপির তরকারির কথা। তিনি নিজেও ভালো রান্না করেন কিন্তু মায়ের হাতের সেই স্বাদ যেন পাননা নিজের ভালো রান্নাতেও। মুছছেন ছোট্ট স্টীলের কড়াইটা, এটাতে হত আমসত্ত্ব খেঁজুরের চাটনি, কিসমিস দেয়া। ছোট ছোট কলাপাতায় করে ভোগ পরিবেশন করা হত সকলকে। এক লহমায় যেন পৌঁছে গেলেন তিনি তাঁর সেই দুবিনুনি বাঁধা সালোয়ারের ওড়না কোমরে জড়িয়ে সবাইকে খাবার পরিবেশনের সময়টায়। যতদিন মা বেঁচে ছিলেন নীলিমাদেবী চলে যেতেন মায়ের কাছে লক্ষ্মীপুজোর দিনটাতে। শ্বশুরবাড়ির লক্ষ্মীপুজো মানে সেটা এক এক বছর এক এক জন করবে পালা করে, মানে ননদ, দেওর এরা আর কি। যার পালা পড়বে সে ছাড়া তার পুজোতে কেউ হাত দেবে না। পরে আলোকিতের পরামর্শে নীলিমাদেবীর মা মারা যেতে লক্ষ্মীর হাঁড়ি থেকে এক মুঠো ধান আলাদা করে তিনি নতুন হাঁড়ি পাতেন। সেই নিয়ে ননদ, দেওর, শাশুড়ি প্রচুর অশান্তিও করেন, কিন্তু নীলিমাদেবীর ঢাল হয়ে আলোকিত সব বিরুদ্ধাচারণের সমুচিত জবাব দেন। তারপরে প্রতিবছর পুজো হয়েছে। আগে পুরুত ডেকে পুজো করাতেন, কিন্তু তাঁদের ভুল উচ্চারণ এবং ভুল পুজো বিধিতে অতিষ্ট হয়ে নিজেই পুজো করেন।

নীলিমাদেবীর দুই ছেলে মেয়ে, নীলিমাদেবীর একমাত্র বোন, তার ছেলে খুব আনন্দ করে প্রতিবার এই লক্ষ্মী পুজোতে। নীলিমাদেবীর মেয়ে এমনিতে কোনো কাজ করেনা ঘরের, সেই মেয়ে পাঁচ ভাজা ভাজে, লুচি ভাজে, বোন নারকোল কুরিয়ে নাড়ু বানিয়ে দেয়, সব্জি কেটে, ময়দা মেখে হাতে হাতে সাহায্য করে, ভোগ নামিয়ে নিয়ে আসে ঠাকুরের সামনে দেওয়ার জন্য। বোনের ছেলে পুজোর জোগাড়ে সাহায্য করে। এবছর ছেলে কর্মসূত্রে বাইরে রয়েছে। করোনার আবহে আসতে পারেনি। মেয়ের এম এর অনলাইন ক্লাস চলছে, সে সারাদিন ব্যস্ত, তাও নারকোল কুরে দিয়েছে, লুচি ভেজে দিয়েছে। বোন আর বোনের ছেলে করোনার কারণেই আসতে পারল না।

তাই নিজের মত ছোট করে পুজো করেছেন তিনি, আলোকিত আর মেয়ে মিলে। এখন এই বাসনগুলো তুলতে তুলতে এইসব স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন তিনি, সেটা করতে গিয়ে বাসন ভরে সিন্দুকটা বন্ধ করে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় মেয়ে এসে ঠাকুরঘরে ঢুকে হাতটা ধরে টেনে বলল “চল না মা ওপরে, নটা বাজে যে, কি করছো তখন থেকে একা একা এখানে।” মেয়ের ডাকে সংবিৎ ফেরে নীলিমাদেবীর, বোঝেন অতীত রোমন্থন করতে গিয়ে এই নিশ্চুপ নিঝুম সন্ধেবেলাটা তিনি পুরোটাই খরচ করে ফেলেছেন। মেয়ের হাত ধরে উঠতে থাকেন ওপরে।

॥অথ প্রতিমা উবাচ (রম্য রচনা)॥

আমার বাড়ির আমার সাংসারিক কাজের সহায়িকা যে মহিলাটি তিনি আসেন খড়িবেড়ে থেকে, গ্রাম্য নিরক্ষর মহিলা কিন্তু অসম্ভব বুদ্ধিমতী, এঁকে দেখে আমি রোজ আমার মেয়েকে বলি যে 'বুদ্ধিং যস্য বলং তস্য' কথাটা কি ভীষণ সত্যি। একদম 'ক' অক্ষর গোমাংস কিন্তু তার নিজের প্রতি কি ভীষণ আত্মবিশ্বাস আর আস্থা সে !!! যাই হোক, সে আমার বাড়ি ছাড়াও আরো কয়েকটা আশেপাশের বাড়িতে এই গৃহ সহায়িকার কর্মটি করে। তার আবার প্রতিটি ব্যাপারে নিজস্ব মতামত দেওয়ার এক অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা আছে। তার নাম প্রতিমা, প্রথমদি সে কাজের কথা বলতে এলে তাকে নাম জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল, "বৌদি, আমি পিতিমে(প্রতিমা), আমায়নককি পিতিমের মতো দেখতে বলে আমায় বাপ নাম দেছিল পিতিমে।" বেশ কালো লম্বা ছিপছিপে আঁটোসাঁটো চেহারাটি তার, আমি একদিন বললাম, "কি সুন্দর গড়ন গো তোমার প্রতিমা!!!" সে গলে গিয়ে বলল,"সেইটাই সবাই বলে গো বৌদি। আজকেরেও রবিজিৎদার বৌ বলতেছিল (অভিজিৎদার)।" অর্থাৎ সে বেশ সচেতন তার চেহারা সম্পর্কে। কিন্তু লক্ষ্মী ঠাকুর কালো ছিলেন বলে আমি অবগত নই, সেটা আমার অজ্ঞতা।

সেদিন সে এসে জানালো পাশের বাড়ির একজনের 'করুণা' হয়েছে, বয়ানটি এইরকম, "ঝানুতো (জানো) বৌদি, অবিকাকুর (যে) বাড়ির সামনেরে ঝে (রবিকাকুর) বাড়িটা গো, ওই মাসিমার 'করুণা' হয়েছে, কালকেরে নাস্সিং হোনে দেল।" আমার ঘরের মানুষটির স্বাভাবিক প্রবণতা সব কিছু নিয়ে মজা করা। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি ঝানলে কি করি?" প্রতিমা উত্তর দিল, "আমি তো রই (ওই) বাড়ি কাজ করি, আজকেরে আমাকে বলল তুমি ঢুকোনিকো, মাসিমাকে রটোতে করে নিয়ে গেছে গো, কি কষ্ট গো দাদা, চোকে দেকি জল আসতি আচে গো দাদা।" একদিন জিজ্ঞেস করল সে, "তোমরা আতে উটি খাও (রুটি)?" বললাম "হ্যাঁ", বলল, "ভালো গো বৌদি, ঝামেলি থাকে না বোলো?" বললাম "হ্যাঁ।"

এহেন প্রতিমা আমার পাশের বাড়িতে কাজ করে যাদের মনের সংকীর্ণতা নিয়ে অনেক ঘটনার আমরা প্রতক্ষ্যদর্শী। সেই বাড়ির বিপত্নীক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ছেলে বৌ নাতির সঙ্গে থাকেন, তাঁর একটি বিবাহিত মেয়েও আছে, মেয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে থাকে। ছেলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, বৌটি এম এ পাশ মেয়ে, কিন্তু সেই ভদ্রলোক খুব খারাপ ব্যবহার করেন ছেলের বৌয়ের সঙ্গে। ওঁর আরেকটা খুব অদ্ভুত স্বভাব ঠিক পুজোর একমাস আগে কোনো না কোনো ছুতোতে কাজের লোককে ছাড়িয়ে দেওয়া যাতে পুজোর বোনাস না দিতে হয়। পুজোর পরে আবার সেই লোককেই ডেকে কাজে রাখবেন বা অন্য কাউকে, কিন্তু পুজোর বোনাস দেবেন না। ওঁর স্ত্রীও স্বামীর সুযোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন, কোনো লোককে এককাপ চা পর্যন্ত দিতেন না, একবারের ঘটনা শুনেছিলাম আমার আর ওর বাড়ির একই লোক কাজ করায়, সেদিন ওই লোকটার খাওয়া হয়নি, ও আমার কাছে খেত। সেদিন আমরা মেয়ের পরীক্ষার জন্য বেরিয়ে গেছিলাম, ও ওদের বাড়িতে গিয়ে বলেছে যে খাওয়া হয়নি, শুনে ওকে ছোট বাটির এক বাটি মুড়ি দিয়েছে একটা বড়ো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, একটু পরে এসে সেই কাঁচা লংকাটার অর্ধেক কেটে নিয়ে বলেছে, "অত বড়ো লংকাটা খেতে পারবি না তো, তাই ভেঙে

নিলাম।" সে পরেরদিন আমাকে এসে বলছে আর দুঃখ করছে ।

এবারে প্রতিমা একবছরের কাজ করছে, পুজোর কয়েকদিন আগে এসে বলল, "ঝানো বৌদি, ওই বাড়ির অবিকাকু (রবিকাকু) কয়েকদিন ধরে খি করতিছে, একদিন ঘর ঝাড়ু দিতি গিয়ে দেকি ঝে মেজেতে পঞ্চাশ ট্যাকার লোট পড়ি আচে, সেদিন তুলে আজাদার বৌয়ের হাতি দিলাম (রাজাদার), পরেরদিন দেকি দুশো ট্যাকার লোট পড়ি আচে, সেদিনও তুলি দিলাম আজাদার বৌয়ের হাতি (রাজাদার), আজকেরে দেকি দুহাজার ট্যাকার লোট পড়ি আচে, আমি তুলি অবিকাকুরে (রবিকাকু) আজ বলিচি ঝে ছাড়াতে হয় এমনি বল চলি যাচ্ছি, এমন নোব (লোভ) দেইখ্যো নিকো, নাব ক্যামন (রবিকাকু) হবে নে। শুনি অবিকাকু (লাভ) করতেছে গো, আমায় বলল দেকছিলুম তুমি ক্যামনধারা নোক, আমি আজাদা (রাজাদা) আর ওর বৌকে ডেকি বলিচি দেকো কাকু ইচ্ছে করি এমন করচিল, শূন্যে (শুনে) ওরাও খুব আগ র):াগকরল (, দেকি কাকু চুপ করি আচে, কি অসৈরন কাণ্ড বলতো।" শুনে আমিও চুপ করেই রইলাম, কারণ প্রতিক্রিয়া দেখালে সেটা আবার প্রতিমাই ওদের বাড়িতে গিয়ে গল্প করবে।

সেদিন কাজে এসে বলল প্রতিমা, "ঝানো বৌদি, আজাদের দিদির এট্টা খোকা হইছে গো আজ (রাজাদের) সকালে, আমায় মোবাইলে ছবি দেকালো, মাতাটা এত্ত বড়ো গো খোকাটার (মাথাটা)।" আমি বললাম, "সদ্যজাত বাচ্ছার ছবি তুলতে ডাক্তাররাই বারণ করেন, বাচ্চাটার ছবি তোলা বোধহয় ঠিক হয়নি।" শুনে প্রতিমা বলল, "বাচ্ছাটা চোক মোট্টে খোলেনি।" বলেই বলল, "অ বৌদি, তোমার মেয়ের এমন হবার ছবি আচে?" আমি বললাম, "না গো নেই, আমার বোনের ছেলের হবার কয়েকদিনের মাথায় আমার ভগ্নিপতি তুলেছিল, আমরা খুব রাগ করে ছিলাম, ডাক্তারবাবুও বকেছিলেন, সেই ছবি আছে।" শুনেই সে, "দেকাও দেকাও" বলে হাতটাত ধুয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল আমার কাছে, সেই ছবি খুঁজে তাকে দেখাতে গিয়ে দেখল বোনের ছেলের সঙ্গে বোনের আর ভগ্নিপতির ছবি। আমার সুদর্শন ভগ্নিপতিকে দেখে খুব গম্ভীরভাবে বিশেষজ্ঞের মতো বলল, "এটা তোমার ভগ্নিপোৎ, এতো একদম পোসেনজিতের বাংলা ফিল্মের-প্রসেনজিৎ) মতো লাগতিছে (হিরো, তেমন চাঁদপানা মুকচোক, তেমনি সব কিছু।" আমি বললাম, "ওমা তাই নাকি, আগে খেয়াল করিনি তো!!!" শুনে পোসেনজিতের সঙ্গে আমার ভগ্নিপতির কোথায় কোথায় মিল সেটা সে বোঝাতে বসল । সব শুনে আমি বললাম, "কিন্তু প্রসেনজিৎ তো 'বেঁটে বড়দা', আমার ভগ্নিপতি কিন্তু বেশ লম্বা আর প্রসেনজিৎ ফর্সা, আমার ভগ্নিপতি কিন্তু ফর্সা নয়।" শুনে সে বলল, "হ্যাতো (এতো) দেখতি গেলি চলে নে গো বৌদি, এই দেকোনা, করিনা কাপুরকে শাড়ি পৈড়ে দিলেই আমাদের মোমতাদিদি নয় (করিনা), কেমন ঠিক বোলতিচি কিনা বল?" বলে সমর্থনের আশায় আমার দিকে তাকালো। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, ধপ করে বসে পড়লাম, মনে মনে বললাম "ওক্কে কর ওগুবির।"

একটু পরে আমার কর্তা এসে বলল, "কি হয়েছে, অমন ধাত ছেড়ে যাওয়ার মতো করে বসে আছো কেন?" আমি তাকে আনুপূর্বিক সব ঘটনা বলতে সে হাসতে হাসতে বলল, "নেশাটা কে করছে কে জানে, কি বলতি কি বলতিছে আর তুমি অমনি সেটা ধরেই বসি পড়লে?" আমি এখনো শকটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি যে

আমার ভগ্নিপতিকে প্রসেনজিতের মতো দেখতে আর করিনা কাপুর শাড়ি পড়লে মমতাদিদি। অবশ্য নাক থাবড়া কোলকুঁজো রাজা ওর কাছে সারুক খান অনেকদিন ধরেই, আমার বোঝা উচিৎ ছিল।

॥বিনিসুতোর সম্পর্ক॥

সকালের ধৌলি ধরে পুরী যাওয়া সেবারে, এ সি চেয়ার কারে উঠে দেখা গেল একদম দরজার পাশের একদিকে দুটো আর একদিকে একটা সিট আমাদের, আরেকটা সিট অন্য একজনের। ট্রলি ব্যাগগুলো লাগেজের জায়গায় রেখে বসেছি সবে, এক বৃদ্ধ দম্পতি ঢুকলেন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, চারটে সিট এগিয়ে তাঁদের বসার জায়গা। ভদ্রমহিলা সুগার পেশেন্ট, আবার বাতের রুগী, তাঁর জন্য তাঁর স্বামী ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক,তিনি আমাদের ঠিক আগের সিটের লোকেদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যদি ওঁদের সিটে বসে ওদেরকে এই সিটগুলো ছেড়ে দেন, নাহলে ভদ্রমহিলার বারে বারে টয়লেট যেতে খুব অসুবিধে হবে। সামনের রোতে তিনটে সিটে তিনজন আলাদা আলাদা লোক যাচ্ছেন ভুবনেশ্বর, তাঁরা বিনা আপত্তিতে উঠে চলে গেলেন ওই বৃদ্ধ দম্পতির সিটে। ওঁদের সঙ্গের ভদ্রলোক ওঁদের ছাড়তে এসেছেন, সম্পর্কে ওঁদের ভাইপো। জয় জগন্নাথ বলে ট্রেন ছাড়ল। আমরা মা আর মেয়ে বসেছি পাশাপাশি, মেয়ের বাবা বসেছে অন্য দিকের আরেকজনের সঙ্গে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা আমাদের দিকের আমাদের ঠিক সামনের সিটে। ওঁদের পাশে প্যাসেজের দিকে বসেছেন এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক।

ট্রেন ছুটছে, সামনের মাসিমা এর মধ্যে বার দুয়েক টয়লেটে গেছেন। আমাদের দেখে আলগা হেসেছেন, আমরাও হেসেছি সৌজন্যের হাসি। তৃতীয় বার খড়গপুরে ট্রেন ঢোকার আগে মাসিমা উঠে টয়লেটে গেলেন, ফেরার সময়ে দরজা খুলে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন আরেকটু হলে আমার কর্তা মশাই চট করে ওঁর রিফ্লেক্সে ধরে ফেললেন ওঁকে আর মাসিমা এতো হকচকিয়ে গেছেন যে কোরিডোরেই বসে পড়ছিলেন আরেকটু হলে, আমি তড়াক করে উঠে আমার সিটে বসালাম, সামনের সিটে মেসোমশাই ওঁর স্বামী কিন্তু কিচ্ছু জানেন না। ট্রেন খড়গপুরে ঢুকল, আমার কর্তামশাই নামছেন দেখে মাসিমা ওকে জল এনে দিতে বলল এক বোতল। এবারে মেসোমশাই উঠে ওঁকে আমাদের সিটে দেখে এগিয়ে এলেন, মাসিমা ওঁকে বললেন উনি যে পড়ে যাচ্ছিলেন সেকথা আর আমার আর আমার কর্তার ওঁকে ধরে ফেলার ঘটনা। মেসোমশাই তো হতবাক হয়ে গেলেন, ইতিমধ্যে আমার কর্তা এসে এক বোতল জল দিলেন মাসিমাকে। মাসিমা প্রথমেই ঢকঢক করে আধ বোতল জল শেষ করলেন, তারপরে আমাকে বললেন উনি আমার সিটে বসে যদি বাকি পথটা যান আমার কোনো অসুবিধে হবে কিনা। আমরা এক কথায় সামনের সিটে উঠে গেলাম কিন্তু ওঁরা চাইছিলেন আমার কর্তা পিছনের সিটেতেই থাকুক ওঁদের স্বস্তির জন্য, তাই হল। মাসিমা মেসোমশাই কিন্তু আমাদের সঙ্গে গোটা রাস্তা গল্প জুড়ে দিলেন ওঁদের নানান কথা নিয়ে। ফলে নামেই আমরা সামনের সিটে বসলাম, সারা রাস্তা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা হল, ট্রেন বেলা চারটেতে পৌঁছল পুরী।

আমাদের ট্রলিব্যাগের সঙ্গে ওঁদের ব্যাগ আর স্যুটকেস আর ওঁদেরকে ধরে ধরে নামালাম আমরা। এবারে ওঁরা এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন, ওঁদের ওঠার কথা ছিল যে হোটেলে সেখানে না গিয়ে আমাদের সঙ্গে চললেন আমাদের গেষ্ট হাউসের পাশের হোটেল সমুদ্রতে। আমরা জিজ্ঞেস করতে বললেন, “তোমাদের কাছাকাছি থাকতে পারব, দুবেলা তোমাদের দেখতে পাব।” আমরা কিছু বললাম না, কপাল ভালো ওঁরা সমুদ্র হোটেলে

ঘর পেয়ে গেলেন, আমরা আমাদের লাগেজ আমাদের গেষ্ট হাউসের কেয়ারটেকারের হাতে দিয়ে ওঁদেরকে সমুদ্র হোটেলেওঁদের নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিয়ে এলাম। কথায় কথায় জানলাম ওঁর একটি মাত্র ছেলে ওয়াসিংটনে থাকে, দুতিন বছরে একবার আসে, টাকা পয়সা দেয়, কিন্তু তাঁর ব্যস্ত জীবনে সময়াভাব। তাই মা বাবাকে সময় দিতে পারেনা। মেয়ে থাকে গুজরাটে, সেও বিবাহিতা এবং ব্যস্ত, তাই বুড়োবুড়ি বড্ডো অসহায়। কলকাতায় বাগবাজারে ওঁদের নিজেদের বাড়ি, ভদ্রলোক রেলে চাকরি করতেন, তাই পাস পান, সেজন্য বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু মাঝে মাঝে বেশ ঝামেলায় পড়েন নিজেদের অশক্ত শরীরের জন্য। সেবারে পুরীতে আমরা ছিলাম সাতদিন, ওঁরা গেছিলেন চারদিনের জন্য, আমাদের সঙ্গে ফিরবেন বলে ফেরার দিনটা আমাদের সঙ্গে ঠিক করে টিকিট পাল্টালেন এবং একই কোচে টিকিট করলেন এক্সট্রা পয়সা দিয়ে। আমাদের সঙ্গে মন্দিরে গেলেন, সমুদ্রের ধারে যেতেন আমার নয় মেয়ের হাত ধরে। স্বর্গদ্বারে যেতেন বিকেলে আমাদের সঙ্গে, এতটাই আমাদের সঙ্গে মিশে গেছিলেন যে স্বর্গদ্বারের যে দোকানে আমরা চা খেতাম বিকেলে, সেটা আমাদের বহুদিনের চেনা দোকান, ওরা আমাদের লাস্ট দশ বছর ধরে চেনে, তারা একদিন জিজ্ঞেস করল যে ওঁরা আমাদের কে হন? আমি বললাম, “মাসিমা আর মেসোমশাই।” আমরা পুরীতে অন্য সাইট সিইং এ বিশেষ যাইনা, তাই সন্ধের পরে রাত দশটা পর্যন্ত আমাদের গেষ্ট হাউসে আমাদের ঘরে বসে গল্প করতেন। মেসোমশাই ভালো আবৃত্তি করতে পারেন, মেসোমশাই সেসব শোনাতেন। আমার কর্তা বেহালা বাজায়, বেহালা নিয়েই যায় বেড়াতে গেলে, সে বেহালা বাজাতো, আমি, আমার মেয়ে গান করি, আমরা গান গাইতাম। দেখতে দেখতে হুস করে সাতদিন চলে গেল, ফেরার পালা এবারে। মাসিমা একেবারে আমাকে আঁকড়ে ধরলেন। ফেরার ট্রেন ওখান থেকে ভোরে, আমরা একসঙ্গে এলাম, এখানে হাওড়া স্টেশনে নেমে আগে ওঁদের ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম, তারপরে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

দিন দশেক পরে একদিন কর্তা অফিসে, মেয়ে স্কুলে, দেখি কেউ বেল দিচ্ছে দরজায় বেলা এগারোটা নাগাদ। দরজা খুলে দেখি মাসিমা মেসোমশাই দাঁড়িয়ে একরাশ খাবার দাবার নিয়ে, এবারে নাকি মেসোমশাইয়ের আমার জন্য খুব মনখারাপ করছিল। আমি সানন্দে ওঁদের বসালাম, আমার ক্ষুদ্র সামর্থে ওঁদের আপ্যায়ন করলাম, সন্ধে ছটায় ওঁরা গেলেন, মেয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে বসিয়ে দিয়ে এলো ওঁদের। তারপরে বহুবার ওঁরা এসেছেন, আমরাও গেছি অনেকবার ওঁদের বাড়িতে। ওঁর ছেলে মেয়ের সঙ্গে, তাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, মাসিমা মেসোমশাই আমাদেরকে মনে করতেন তাদের আরেকটা মেয়ে জামাই। খুব স্নেহ করতেন, মাঝে মাঝেই চলে আসতেন আমার কাছে সকালের দিকে। আসলে নিজেদের নিঃসঙ্গ জীবনে আমাদের জড়িয়ে ওঁরা আনন্দ পেতেন। আমরাও ওঁদের স্নেহে শীতল ছত্রছায়াতে, ওঁদের ঋদ্ধ অভিভাবকত্বে আনন্দিত হতাম। বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ পনেরো দিনের আগে পরে মেসোমশাই আর মাসিমা চলে গেলেন। এখনো অবসরে ওঁদের কথা মনে হলে ভাবি যে শুধু অন্তরে টানে কি নিবিড়ভাবে মানুষ একে অপরকে কিভাবে আপন করে নেয়!!!

॥ব্যাঁঘাত॥

রায়পুরের গঙ্গার ধারে আঁশশেওড়া গাছের জঙ্গল। দিনের বেলায় ওইদিকটাতে যেতে লোকে ডরায়, হোথায় নাকি তেনারা আস্তানা গেড়েছেন অনেকদিন ধরে, সারাদিন ধরে একটা শনশন করে হাওয়া বয় এদিকটাতে। লোকালয় ছাড়িয়ে জায়গাটা বলে এদিকটাতে লোক বসতি প্রায় নেই বললেই হয়, আরেকটু এগোলেই শ্মশানের শুরু, একদম খাঁ খাঁ করে। কেউ আসেও না এদিকে খুব প্রয়োজন না পড়লে।

এই ফাঁকা জলের ধারে নদীর কোল ঘেঁষে জায়গাটা ভারী পছন্দ হয়েছে লোকেশন হিসেবে ফিল্মের ডিরেক্টর অন্তুদার। তাই পুরো ফটোগ্রাফার শুদ্ধু ইউনিটের বেশ কিছু লোককে পাঠিয়েছে এই সন্ধের শট নিতে। সন্ধ্যেবেলায় জলের ধারে শুটিং করবে বলে অন্তুদা, সিনেমার ডিরেক্টর অতীন্দ্র সান্যাল হাতকাটা পঞ্চাকে পাঠিয়ে দিলেন আলো সেট করে ক্যামেরাম্যান সৌভিককে দিয়ে সন্ধের শটগুলো নিয়ে নিতে। এসে ইস্তক পঞ্চার গাটা কেমন যেন ভারী ভারী ঠেকছে, কিন্তু পেটের দায় যে বড়ো দায়। মায়ের হাঁপানির ধাত, তার জন্যে সদরে নিয়ে গিয়ে কটা টেস্ট করাতে বলেছে ডাক্তার, তার জন্যে তো টাকা চাই, তাই রাজি হয়েছে পঞ্চা। নদীর ধারের গাছ ঘেঁষে শটগুলো ক্যামেরাতে তুলে এবারে জলের ধারের ঘাসের শট নেবে বলে যেই না এগিয়েছে সৌভিক পঞ্চাদের নিয়ে এমন সময় শোনে খোনা গলায় চুন্নিদিদির হুমকি, “বোঁলি ওঁ হাঁড়হাভাতের পোঁয়েরা, সোঁন্ঝে বেলায় সোঁবি পাঁ দুঁটো ঝুঁইলে এঁসি বঁসেছিলাম জঁলার ধাঁরে গাঁছের ওঁপরে এঁট্টু খেঁতি, হাঁতে চাঁরটে কাঁচা গুঁগলি, এঁট্টা পঁচা শোল মাছ আর এঁকটা পঁচা গোঁরুর খুঁলি নেঁ বোঁসিচি জঁম্মে , এঁমন সোঁময় হোঁটাৎ এঁকটা ষণ্ডাপানা লোঁক তাঁর দলবল নে এঁতোগুলো আঁলো জ্বেলে এঁমন তাঁড়া দেল জেঁ সোঁজা সোঁড়াৎ কোঁরি নেমি এঁই ঘাঁসের মদ্দি এঁসে পোঁরনু। এঁখেনেও তোঁরা ক্যামেরা নে ধাঁওয়া কোঁরেছিস ছোঁবি তুলতি, আঁমাকে শাঁন্তিতে এঁট্টুসখানি খেঁতেও দিঁবি নি সোঁবরে বোঁসি সুঁমুনদ্দির পোঁয়েরা? শাঁকচুন্নির আঁগের আঁচ এঁবারে বুঁইজে দিঁচ্ছি তোঁদের। সোঁবেতে ব্যাঁঘাত ঘোঁটানো তোঁদের, দাঁড়া হোঁচ্ছে তোঁদের!!!” এহেন বাক্যি শুনেই আর দাঁড়ানো নেই পঞ্চার, সে তো টেনে দৌড় দিয়েছে।

আর সৌভিক দেখে জলের ধারে একটা আলো মাঝে মাঝে দপদপ করে জ্বলছে আর নিভে যাচ্ছে। ইউনিটের সিকিউরিটি বিশুদা তাই দেখে সৌভিকের হাত ধরে একটান দিয়ে সরিয়ে এনে সব ক্যামেরা আর আলো গুটিয়ে নিয়ে প্রাণপনে গাড়িতে তুলেছে। ফেরার জন্যে গাড়িতে উঠে বসতেই দেখে একটা সাদা বেক্ষদত্তি তার সাদা উড়ুনি উড়িয়ে এগিয়ে আসছে সাথে কন্ধকাটাকে নিয়ে আর তাদের পালিয়ে চলে যেতে দেখে চুন্নিদিদির সঙ্গে তাদের সে কি “হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ” করে হাড়ে হিম ধরানো হাসি ওই মুলোর মতো দাঁত দেখিয়ে যা নজরে পড়তে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড় সবার। রামনাম, কৃষ্ণনাম, কালীনাম কিছুই তখন মনে পড়ছে না, শুধু হাত পা ঠান্ডা হয়ে জিভ শুকিয়ে কোনো রকমে ইউনিটের গাড়ির ড্রাইভারকে বলতে পেরেছে তাড়াতাড়ি গাড়িটা চালাতে আর মনে মনে বলছে “যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।”

॥পলায়ন॥

অনেকদিন পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে এসেছে মৈথিলী। বর প্রদীপ্ত ছমাসের প্রজেক্টের অনসাইট এসাইনমেন্ট নিয়ে জার্মানি গেছে, পাঁচ বছরের ছেলে রঙ্গিত আর সাত বছরের মেয়ে রঞ্জনার স্কুলের সামার ভ্যাকেশন শুরু হতেই আর দেরী করেনি মৈথিলী। একেবারে দুটো ট্রলি নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসেছে হাওড়া থেকে ভোরে দুই ছানাদের সামলে নিয়ে। মা বাবার বয়স হয়েছে, এবারে বাবার হার্টের সমস্যা দেখা দেওয়ায় তিনি একটু দমে গেছেন। মা বাবার কাছে অনেকদিন গিয়ে থাকা হয় না বাপেরবাড়ি বালাসোরে। ভাই অনিকেত চাকরিতে ঢুকেছে সবে, সে মা বাবাকে সেভাবে সময় দিতে পারেনা। তাছাড়া একটা জিনিস মৈথিলী বোঝে, সে মা বাবাকে যতটা যেভাবে বোঝে সেভাবে ততটা বোঝা অনিকেতের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ মেয়েরা মনের দিক দিয়ে মা বাবার অনুভূতির অনেক নিকটের হয়, এটা অনিকেতের দোষ নয়, ছেলে আর মেয়ের মানসিক গঠনের তফাৎ।

যথাসময়ে ট্রেন ওদের বালাসোরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল, বাবার বিশ্বস্ত লোক প্রকাশদা ওদের নিতে এসেছিল স্টেশনে। ছেলে রঙ্গিত আর মেয়ে রঞ্জনা সারা রাস্তা বকবক করে নানান প্রশ্নে মৈথিলীকে ব্যতিব্যস্ত করে খেয়েছে। বালাসোরে নেমে প্রকাশদাকে দেখেই দুজনে দৌড়ে গিয়ে তার দুদিকে ঝুলে পড়ল, ধমকে ওদের সংযত করে মৈথিলী উঠে বসল ওদেরকে নিয়ে বাবার পুরোনো ওয়াগনার গাড়িটাতে। স্টেশন থেকে ঘন্টা খানেকের রাস্তা ওর বাপেরবাড়ি। একসময় পৌঁছেও গেল, বাগান পেরিয়ে ঢোকার মুখে হঠাৎই ওর দৃষ্টি আটকে গেল বাগানে ঝুলন্ত দোলনাটাকে দেখে। ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, ওর মনের অনেক দোলাচলের সাক্ষী এটা। বালাসোরের খুবই অভিজাত এলাকায় ওদের বাড়িটা, বাবা ছিলেন আই টি আর চাঁদিপুরের উচ্চপদের বিজ্ঞানী, তাই বাঙ্গালী হয়েও একটু মফঃস্বল ঘেঁষা এই বালাসোরেই বাড়ি করে রয়ে গেছেন।

মায়ের ডাকে সচকিত হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল মৈথিলী। মা বাবা দুজনেই ওদের পেয়ে ভীষণ খুশি হলেন আর রঙ্গিত আর রঞ্জনা দুজনেই এতো বড়ো বাড়ির চৌহদ্দিতে বাগানের মধ্যে নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পেরে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল। ওরা এমনিতেই মামার বাড়ি আসতে খুব ভালোবাসে তাদের উপরি পাওনা দাদু দিদু মামুর আদরের জন্য। এবারে এতো বড়ো দীর্ঘ ছুটিতে এখানে থাকতে পারবে জেনে ওরা খুব আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। আর মৈথিলীর গোটা মন জুড়ে আবার নতুন করে ঠাঁই নিল ওই বাগানে টাঙ্গানো দোলনাটা। দিনের মধ্যে মাঝে মাঝেই এসে ও দোলনাটাতে বসে, ওর মনের অস্থিরতা যেন ধরা দেয় দোলনার দোলনে। ঘুরতে ফিরতে যতক্ষণ বাড়ির মধ্যে থাকে ওকে পাওয়া যায় ওই দোলনাটার ওপরে। এমনকি মাঝে মাঝে ওর ছেলে মেয়ের সঙ্গেও ওর ঝামেলা হয়ে যায় ওই দোলনাতে বসা নিয়ে, আসলে প্রদীপ্তর বাইরে থাকা, ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব, মা বাবার অসহায়তা সব মিলিয়ে ও যে অস্তিত্বের দোলাচলের মধ্যে রয়েছে তার সঙ্গে দোলনার দোলাটা যেন কখন সমার্থক মনে হয় ওর। মা সুপ্রীতিদেবী আর বাবা অতনুবাবু দুজনেই মুখ টিপে প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন মেয়ের এই ছেলেমানুষী দেখে।

আসলে মৈথিলীর জন্যই এই দোলনাটা বাগানে লাগিয়েছিলেন অতনুবাবু। পাড়ার পার্কে দোলনায় উঠে ছোট্ট মৈথিলী নামতে চাইত না, সেই নিয়ে পাড়ার বাচ্ছাদের সাথে মন কষাকষি পর্যন্ত হয়ে গেছিল কিন্তু মৈথিলীর ওই দোলনা চড়ার নেশা ছাড়ানো যায়নি। তাই একরকম বাধ্য হয়েই এই দোলনাটা বাড়ির বাগানে লাগান স্ট্যান্ডসমেত অতনুবাবু। বেশ শক্তপোক্ত লোহার বড়ো সোফার মত দোলনাটা, তিনজন পাশাপাশি বসা যায়, সাদা রং করিয়ে বাগানের একটু ভেতরের দিকে এটাকে লাগানো হল আর মৈথিলীর বাড়ির বাইরে বেরোনোর সব আকর্ষণের ইতি হয়ে গেল ওখানে। সে সকালে স্কুলে যাবার আগে স্কুলের ড্রেস পরে একটু দোল খেয়ে নেয়, বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে ওই দোলনাতে বসেই দুলতে দুলতে বিকেলে খাবার খায়, পড়া মুখস্ত করে ওই দোলনাতে বসে আর রাত্রে পড়ে উঠে আধঘন্টা অন্তত তাকে বসে দোল খেতে হবে রাত্রে খাওয়ার আগে। রাত্রেও ওটাকে ছাড়ে না দেখে জায়গাটা বাঁধিয়ে মাথায় স্বচ্ছ শেড দিয়ে আলো লাগিয়ে সুরক্ষিত করেছিলেন অতনুবাবু যাতে কোনো অসুবিধে না হয় মৈথিলীর। বড়োই আদরের ছিল তাঁদের কাছে মৈথিলী। ভাই অনিকেতের সঙ্গে এই দোলনা নিয়ে কত ঝগড়া হয়েছে। ওদের দুই ভাইবোনেরই খুব প্রিয় ওই দোলনাটা।

কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই দোলনাটার সঙ্গে মৈথিলীর, লুকিয়ে আচার খাওয়া, তেঁতুলের চাটনি লুকিয়ে খাওয়া, গাছের পেয়ারা, কাঁচা আম সেও এখানে বসেই আয়েস করে খাওয়া। শীতের সকালে মায়ের করা পিঠে পুলি এই দোলনাতে রোদে পিঠ রেখে দোল খেতে খেতে খাওয়া, হেমন্তের দুপুরে উদাস হয়ে আকাশে দিকে চেয়ে এলোমেলো চিন্তা করার একমাত্র জায়গা ছিল এই দোলনাটা। প্রথম আমের মুকুল আসলে এই দোলনাতে বসেই দৃষ্টিগোচর হত, তার ঈষৎ কষাটে মেশা অঘ্রাণ নেওয়া, লাল পলাশের রঙের বাহার দেখা, বৃষ্টি ঝরা মেঘলা ভিজে বাতাসের শিরশিরানি নিয়ে বৃষ্টির ধারাপাত দেখা, কালবৈশাখীর আগমন বার্তা, শরতের শিউলির গন্ধ এই দোলনাটাতে বসেই ও পেত। প্রথম কবিতা লেখা ওর এই দোলনাতে বসে, প্রথম প্রেমিকের প্রপোজ করা এই দোলনার সামনে, প্রথম প্রেমে পড়ে সেই প্রেমপত্র পড়ার জায়গা এই দোলনাটা, প্রথম প্রেমের চুম্বনও এখানে বসে আবার সেই প্রেমিক যখন বর হয়ে অষ্টমঙ্গলায় এসেছে তার সঙ্গে খুনসুটির সাক্ষী এই দোলনাটা থেকেছে। প্রথম সন্তান কোলে নিয়ে এসে মৈথিলী বসেছে এই দোলনায়, সন্তানদের দোলা দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে এই দোলনায় শুইয়ে পাশে নিজে বসে থেকে। আজ এতদিন পরে এখানে এসে বারবার মনে হচ্ছে কি করে এতদিন ভুলে ছিল এই দোলনাটাকে।

সেদিন মায়ের সঙ্গে বসে রান্না জোগাড় করছিল মৈথিলী, হঠাৎ খেয়াল হল ছেলে মেয়ে দুটোকেই বহুক্ষণ দেখছে না, তাড়াতাড়ি সব ফেলে বেরোতে গিয়ে দেখে দুটোতে দোলনাতে বসে গুছিয়ে আচারের শ্রাদ্ধ করছে আর কি কথায় আপনমনে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। ওদের দেখে হঠাৎই নিজের ছোটবেলাটা যেন ভেসে উঠল চোখের সামনে, ও আর অনিকেত ওরা দুই ভাইবোনও তো এমনি করেই দোলনায় বসে নিজেদের একান্ত আপনার কথাগুলো ভাগ করে নিত ওখানে বসেই। ওদের আর বকুনি দেওয়া হল না মৈথিলীর ।সেই তারই ট্রাডিশন যেন বয়ে চলেছে তার সন্তানদের মধ্যে দিয়ে।

আরেকদিন অনিকেতের আসার কথা তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বাড়িতে। সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষন, রাত নটা বাজতে যাচ্ছে, কেন এতো দেরী হচ্ছে এগিয়ে দেখতে গিয়ে দেখে সেই দোলনায় বসে অনিকেত আর তার

বান্ধবী গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে চুম্বনে রত। দেখে নিঃশব্দে সরে আসে মৈথিলী। পরে নিজেই ভেবে দেখে যে দোলনার উত্তরাধিকার এখন ভাই এবং তার পরিবারের, মৈথিলী এখানে দুদিনের অতিথি মাত্র। দোলনাটা তার জন্য লাগানো হলেও এখন আর সে দোলনার মালকিন নয়, সে এখন নিজের হাতে গড়া নিজের সংসার সাম্রাজ্যের মালকিন। এখন এখানে দু চার দিন, বড়োজোর মাসখানেক এসে থাকতে সে পারে কিন্তু এখানকার জিনিসের ওপরে তার সেই আধিপত্য আর বজায় নেই।

পরের শনিবার বাড়ির সকলে মিলে তারা গেল রমনাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরে পুজো দিতে, সেখান থেকে ফেরার সময় চাঁদিপুরের সমুদ্রতট ছুঁয়ে বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। তার পরেরদিন গেল বহুবছর পরে পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে, সেখানে ঘুরে দেবকুণ্ড ঘুরে তারা ফিরল বিকেল নাগাদ। ফিরে এসে হাত পা ধুয়ে মা চা করছেন দেখে মৈথিলী গিয়ে বসল দোলনাটাতে। নিজের প্রিয় সঙ্গীর মতো দোলনাতে গা এলিয়ে নিজের মানসিক চাঞ্চল্য ভাগ করে নিতে বেশ কিছুক্ষন বসে রইল গুনগুন করতে করতে। রাত্রে খেতে বসে মৈথিলী জানালো তারা পরেরদিন কলকাতায় ফিরবে। মা বাবা, মৈথিলীর নিজের ছেলে মেয়েরা সবাই খুব অবাক হল কারণ আরো হপ্তাখানেক পরে বাচ্ছাদের ছুটি শেষ হচ্ছে, কিন্তু মৈথিলীর ফেরার সিদ্ধান্ত পাল্টালো না। স্টেশনে পৌঁছতে এসে বাবা জানতে চাইলেন, “এমন হঠাৎ করে চলে যাবার কি হল রে তোর?” মৈথিলী উত্তর দিল, “বাবা, আর কিছুদিন থাকলে ওই দোলনাটার মায়ায় এমন জড়িয়ে যেতাম যে আর ওটাকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না, তাই মায়া না বাড়িয়ে পালাচ্ছি গো, চেষ্টা করছি দোলনাটার মায়া কাটাতে।” নিজের মনের দোনামোনা ভাব সামলে একটু কষ্ট হলেও মৈথিলী আপন সত্তার দৃঢ়ভূমিতে নিজেকে যেন প্রতিষ্ঠিত করল এই হঠাৎ ফিরে যাবার সিদ্ধান্তটা নিয়ে। অতনুবাবু সজল চোখে মেয়েকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন আর মৈথিলীও সজল চোখে চলল নিজগৃহ পানে সন্তানসহ।

॥ম্যাজিক॥

অফিস থেকে বেরোতে সোমবার দেরী হয়েছে সুমিতের। হঠাৎ কতগুলো জরুরি রিপোর্ট চেয়ে পাঠালো কর্পোরেট অফিস থেকে, সেই কম্পাইলেশন করে সেগুলো পাঠিয়ে যখন গাড়িতে উঠল সে তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে আটটা বাজে। বাড়িতে ঢুকে সুমিত দেখল পাঁচ বছরের মেয়ে সৌমী মুখটা কেমন থমথমে, চোখের কোলে জল, অন্যদিনের মতো বাপি বাপি বলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল না আজ, সুমিতও মেয়ে অন্তপ্রাণ। সাধারণত মেয়ে সৌমী বেশী হাসিখুশি, বরং ছেলে সৌভিক একটু চুপচাপ, শান্ত, আট বছরের ছেলে কিন্তু বেশ পরিণত। জুতো ছেড়ে তাদের ডুয়াল অ্যাপার্টমেন্টের দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দেখে স্ত্রী প্রজ্ঞা বাইরের দিকে মুখ করে নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে। সুমিত হতভম্ব। শেষে মা শীলা দেবীকে জিজ্ঞেস করে রহস্য উদ্ধার হল।

বিকেলে প্রজ্ঞার সঙ্গে সৌমি আর সৌভিক গেছিল সামনের পার্কে বেড়াতে যেমন রোজই যায়, সেখানে গিয়ে সৌমি মহানন্দে পার্কের দোলনাতে দোল খাচ্ছিল। একটু ভীড় বাড়তেই অন্য বাচ্ছারা এসে যেতে তারাও দোলনাতে চড়বার জন্য জেদ করতে থাকে আর সৌমিও কিছুতেই নামবে না দোলনা ছেড়ে। শেষ রুকুনের মা বুঝি হাত ধরে নামিয়েছে সৌমীকে আর প্রজ্ঞা আটকাতে গেলে ওকে অনেক কথা বলেছে যেটা রীতিমতো অপমানজনক। পার্ক থেকে মা আর বোনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়িতে এনেছে সৌভিক কিন্তু মা প্রজ্ঞা আর মেয়ে সৌমির কান্না আর বন্ধ হচ্ছে না। প্রজ্ঞা ভুলতে পারছে না রুকুনের মায়ের বাক্যের হুল আর সৌমীর ওকে দোলনা থেকে নামিয়ে দেবার শোক আর যাচ্ছে না।

BANGLADARSHAN.COM

সুমিত সব শুনে কিছুক্ষন গুম হয়ে রইল। মেয়েকে সৌমীকে নানান হাসি মজার কথা বলে সমে ফেরাতে পারলেও প্রজ্ঞাকে কিছুতেই স্বাভাবিকতায় ফেরাতে পারছে না। বেচারা কিছুতেই রুকুনের মায়ের অপমানটা মন থেকে মুছতে পারছে না। বাড়িতে ঠিক যেন ছন্দে নেই সব। সুমিতের এটা একদম ভালো লাগছে না। দিনের শেষে এই বাড়ির লোকগুলোকে একটু আনন্দ দিতেই তো তার এতো পরিশ্রম করা, সেখানে তাল কাটলে জীবনটা কেমন আলুনি লাগে যেন!!!!

পরের শনিবার সুমিত সক্কালবেলায় বেরিয়ে গেল, ফিরল বেলা এগারোটায়, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে রাজমিস্ত্রি রামপদকে। রামপদকে নিয়ে ওদের অ্যাপার্টমেন্টের দক্ষিণের বারান্দায় কি সব কাজ করাল, প্রজ্ঞা ছেলে মেয়ের সোমবারের উইকলি টেস্টের প্রিপারেশনে ব্যস্ত রয়েছে ভেতরের স্টাডিরুমে। মা শীলাদেবী রান্নার লোককে নিয়ে ব্যস্ত রান্নাঘরে। বেলা বারোটায় একটা বেল বাজল, প্রজ্ঞা দরজা খোলার জন্য আসার আগেই সুমিত দরজা খুলতে গেল, প্রজ্ঞা গিয়ে আবার ছেলেমেয়ের কাছে বসল তাদের পড়ার শেষভাগটা নিয়ে।

বেলা দেড়টা নাগাদ সবাই খেতে বসবে, তার আগে সৌমী আর প্রজ্ঞা স্নান সেরে বেরোলে সুমিত দুজনকে বলল দক্ষিণের বারান্দায় যেতে। দুজনে গিয়েই ছুট্টে এসে ওকে দুদিক থেকে জড়িয়ে ধরল। শীলাদেবী ব্যাপারটা সরেজমিন দেখতে গিয়ে একমুখ হাসি নিয়ে এসে ছেলের গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। এবারে

সৌভিকের টনক নড়ল, সে দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে এসে বলল, “বাবা, দারুণ সারপ্রাইস দিলে যা হোক”, ছোট্ট সৌমী বুঝেই পাচ্ছে না কি করে বাবাকে ‘থ্যাংক ইউ’ বলবে। সুমিত সকালে গিয়ে দেখে শুনে একটা দোলনা কিনে এনে রাজমিস্ত্রি রামপদকে দিয়ে সেটা লাগিয়েছে ওই দক্ষিণের বারান্দায়, যখন ছেলেমেয়েকে নিয়ে প্রজ্ঞা পড়ানোয় ব্যস্ত ছিল আর মা শীলাদেবী ব্যস্ত ছিলেন রান্নাঘরে আর তার ম্যাজিকেই আজ আবার তার সাধের পরিবারের পুরোনো ছন্দ ফেরত এসেছে। রাত্রে শুতে এসে প্রজ্ঞা তো ওকে জড়িয়ে কেঁদে ভাসালো। সুমিত শুধু বলল, “তোমাদের সবার হাসিমুখটাই তো আমার দিনের শেষের প্রাপ্তি, সেটা যাতে না হারায় তাই এটুকু করতেই হল জানো, ওখানে কোনো কম্প্রোমাইস করতে পারলাম না।”

BANGLADARSHAN.COM

॥সিলেক্টেড॥

অয়ন্তিকা ভীষণ ভেঙে পড়েছে। অয়ন্তিকা স্নাতক স্তরে পড়ে একটা নামী কলেজে মনোস্তত্বে অনার্স নিয়ে। অয়ন্তিকার আজকে মনস্তত্ত্বের প্রাকটিক্যাল হবার কথা ছিল পার্ট ওয়ানের। একদম সাদাসিধে সরল মেয়ে অয়ন্তিকা। একটা নামকরা মিশনারি কনভেন্ট থেকে আই সি এস ই পাশ করে শুধুমাত্র মনস্তত্ত্ব ভালোবাসে বলে আরেকটা কনভেন্টে ভর্তি হল এবং সেখানে স্কুলে টপ করে 96% মার্কস পেয়ে পাশ করে ভর্তি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি খুবই নামকরা কলেজে। অয়ন্তিকা খুবই সুন্দরী কিন্তু যেহেতু সহজ সারল্যে ভরা ওর ব্যবহার আর স্বভাব তাই বহু ছেলে পতঙ্গের মত আকর্ষিত হয় ওর দিকে কিন্তু ওর সেসব দিকে বড়ো একটা আকর্ষণ নেই। পড়াশোনা, গান, একটু লেখালেখি এইসব নিয়েই ও মেতে আছে, অন্তর্মুখী স্বভাবের বলে মা বাবা ছাড়া কারুর সঙ্গে তেমন সখ্যতা গড়ে ওঠেনি ওর।

একটা ব্যান্ডের ফিমেল লিড সিঙ্গার অয়ন্তিকা, স্কুলের সব বন্ধুদের নিয়ে এই ব্যান্ডটা তৈরী হয়েছিল, ওরা দূরদর্শনে প্রোগ্রাম করেছে, ওদের ব্যান্ড একটা অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে জিতেছেও দুবার, কিন্তু সবাই পড়ছে বলে আর ঘন ঘন প্রোগ্রাম করা হয়ে ওঠেনা ওদের। কলেজে ঢোকার সময় তিয়ান এগিয়ে এসে কথা বলেছিল, তিয়ান অয়ন্তিকাকে চেনে ওর ব্যান্ডের মাধ্যমে, ব্যান্ডের মেল লিড প্রিয়ব্রতর সঙ্গে ম্যান্ডোলীন বাজায় তিয়ান। প্রিয়ব্রত অয়ন্তিকার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ভাইয়ের মতো। সে কিন্তু অয়ন্তিকাকে প্রথমেই বলেছে তিয়ান ভালো ছেলে নয়। তারপর অয়ন্তিকা জানতে পারল তিয়ান ওদের বাড়ির দিকেই থাকে, আবার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের কাছে একই ব্যাচে ওরা টিউশন নেয়। তিয়ান সারাক্ষণ অয়ন্তিকার সঙ্গে লেপ্টে থাকার চেষ্টা করছে যে সেটা অয়ন্তিকা বুঝতে পারছে, কিন্তু ক্লাসমেট বলে কিছুতেই এড়াতে পারছে না। হঠাৎ একদিন টিউশনের বাইরে তিয়ান প্রপোজ করে বসল অয়ন্তিকাকে হাতে গোলাপ ফুল নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, অয়ন্তিকা রিফিউজ করল বটে কিন্তু পুরো ঘটনাটা দেখেছেন ওদের হেড অফ থেকে ডিপার্টমেন্ট দীপা ম্যাম। তিনি আবার ডিভোর্সি, কিন্তু সকলের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলিয়ে দেন যখন তখন আর সেটার বিরোধিতা কেউ করলে একদম প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে ওঁর। তাই তিনি যখন অয়ন্তিকাকে বললেন যে সে কেন তিয়ানকে রিফিউজ করল, অয়ন্তিকা তাঁকে বলল যে এটা যেহেতু ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই এটার কোনো এক্সপ্লানেশন ও দীপা ম্যামকে দেবে না। উনি বিলক্ষণ চটলেন আর তিয়ান তো রিফিউজড হয়ে একদম ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। এবারে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার আগে ও তিয়ানকে যখন জিজ্ঞেস করল প্রাকটিক্যাল খাতাগুলো নিয়ে যেতে হবে কিনা পরীক্ষার সেন্টারে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার দিন, তিয়ান বলল যে না নিয়ে যেতে হবেনা। অয়ন্তিকার প্রাকটিক্যালের পার্টনার ছিল যে অলিপা সেও বলল যে প্রাকটিক্যাল খাতা নিয়ে যেতে হয় না। বেরোনোর সময় ওর মা বলল যে প্রাকটিক্যাল খাতা ও নেবে কিনা, ও বলল নিতে হবে না। ও নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দিতে গেল, ওর মনস্তত্বের সাবজেক্ট হয়ে গেল ওর আরেক বন্ধু অদিতি, পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে লোরেটোতে, সঙ্গে মা বাবা গেছেন। অয়ন্তিকা সেন্টারে গিয়ে শুনল যে প্রাকটিক্যাল খাতা ছাড়া পরীক্ষায় অবসেন্ট মার্ক হয়ে যাবে, লোরেটো কলেজ থেকে ওদের কলেজের ডিপার্টমেন্টাল হেড দীপা ম্যামকে ফোন করল, তিনি বললেন যে তিনি দেখছেন কি করা যায়। এদিকে সারাদিন সেন্টারে থেকে বিকেলে অয়ন্তিকা বাড়ি এলো, এসে থেকে গুম মেরে আছে, মা বাবাকে

বলতে পারেনি যে ওকে অবসেন্ট মার্ক করবে বলেছে। পরেরদিন ডিপার্মেন্টাল হেড দীপা ম্যাম ফোন করে ওর মা বাবাকে বললেন সব আর বললেন যে উনি ফোন করে দেখতে চাইছিলেন যে পরীক্ষায় অবসেন্ট মার্ক হয়ে অয়ন্তিকা মেট্রো রেলে সুইসাইড করেছে কিনা কারণ সেদিনই পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে একটি মেয়ে সুইসাইড করেছে। বলে বললেন তিন দিনের মধ্যে একুশটা খাতা তৈরী করে ওদের কলেজে জমা দিলে উনি কন্ট্রোলারের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন কিছু করা যায় কিনা। তিনদিন অয়ন্তিকার আর ওর মা বাবার সর্বস্ব মাথায় উঠল, তৃতীয় দিন বেলা দুটোয় খাতাগুলো শেষ করে ও ওর মায়ের সঙ্গে কলেজের জন্য বেরোনোর আগে ফোন করল ডিপার্টমেন্টাল হেডকে, উনি বললেন যে ওর খাতা জমা দিয়ে লাভ নেই, কারণ উনি কিছু করতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বসে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল অয়ন্তিকা কারণ ওর সেই বছরটা নষ্ট হয়ে গেল। পরের বছরে ও ক্যাজুয়াল ক্যান্ডিডেট হয়ে ক্লাস করতে গিয়ে শুনল যে ডিপার্টমেন্টাল হেড অন্য অনেকের এমন প্রাকটিক্যাল খাতা না নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় অন্য দিনে ডেট দিয়ে পরীক্ষা নিইয়েছেন, এটা করা যায়, এর জন্য করো কাছে পারমিশন নিতে হয় না, এটা সম্পূর্ণ ওর ইচ্ছাধীন ব্যাপার। ওই যে সেদিন টিউশনে অয়ন্তিকা ওকে ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলাতে বলেছিল তার প্রতিশোধ উনি এইভাবে নিলেন, অসম্ভব ভিন্ডিক্টিভ মহিলা উনি।

পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বেরোলে দেখা গেল সেবছরে অয়ন্তিকা শুধু ওই প্রাকটিক্যাল বাদে সব পেপারে সত্তর শতাংশ নম্বর পেয়েছে। আর তিয়ান ওকে মিসগাইড করে ওর বছর নষ্ট করে রিভেঞ্জ নিল। অয়ন্তিকা হাতের শিরা কেটে আত্মহননের রাস্তা নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মায়ের সজাগ নজরে শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায়। ওদের ডিপার্টমেন্টাল হেডের কাছে ও থ্রেট হয়ে গেছিল ওর মেধা আর জ্ঞানের গভীরতার জন্য কারণ উনি নিজে ছ ছটা বছর নষ্ট করেছেন এই স্নাতক স্তর ডিঙোতে আর শেষে ক্ষমতাসীন দলের লোকজনকে ধরে আজকে অযোগ্য হয়েও পার্টি লেভেলের যোগাযোগের কারণে অনেককে কপটতা করে মেরে, অনেক সিনিয়রকে টপকে ওই জায়গায় গিয়ে বসেছেন এবং এইভাবে ছেলে মেয়েদের বছরের পর বছর ধরে সর্বনাশ করে চলেছেন ওঁর কথামতো না চললে।

শুরু হল অয়ন্তিকার কলেজে সবসময় অপমানিত হবার সময়। ওকে ওদের ডিপার্টমেন্টাল হেড এবং অন্য শিক্ষকরা সারাক্ষন ক্যাজুয়াল ক্যান্ডিডেটদের এটা ভালো না, এই সাবজেক্ট ওদের জন্য নয়, এরা এই স্নাতকস্তরের যোগ্য নয় বলতে থাকে সর্বদা, অথচ যখন ইউজিসি থেকে সার্টিফিকেশনের ব্যাপার থাকে ওর ঘাড় দিয়ে প্রেসেন্টেশন করিয়ে নেয়, ওকে দিয়ে ক্লাসকে, ডিপার্টমেন্টকে রিপ্রেসেন্ট করায় কিন্তু কোথাও ওর নামে কিছু স্বীকৃতি দেয় না। ওদের সাইকো থেরাপি ইউনিটে রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে সিলেকশন হয়ে ও থেরাপি দিল টানা একবছর যার জন্য ওদের ডিপার্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেল কিন্তু ওকে কোনো স্বীকৃতি দিল না শেষে হতাশ হয়ে ও ছেড়ে দিল থেরাপিষ্টের কাজটা। একটা সময় এমন গেছে ওর যে ও কলেজে যেতে চাইত না অপমানিত হবার ভয়ে, কেউ একটুও সহানুভূতি নিয়ে ওর পাশে দাঁড়ায়নি শুধু মা বাবা ছাড়া। দেখতে দেখতে আবার পার্ট ওয়ান পরীক্ষা হল, ও ভালোভাবে পাশ করল, পার্ট টুও পাশ করল।

ফাইনাল ইয়ারের একটা প্রাকটিক্যাল হয়ে করোনার কারণে লকডাউন হয়ে গেল মার্চ মাসের পরে। দীর্ঘ সাত মাস নানান চাপান উতোর চলল ওদের ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে। কখনো রাজ্য সরকার বলল পরীক্ষা না দিয়ে

আগের বছরের রেজাল্টের ভিত্তিতে ওদের পাশ করিয়ে দেবে। বাদ সাধল ইউজিসি, তারা বলল না পরীক্ষা নিতেই হবে, সেই নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ইউজিসির ঝামেলা শুরু হতে মামলা হল সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট পরীক্ষা নেবার সপক্ষে রায় দিল। শেষে পয়লা অক্টোবর থেকে চারদিন ধরে অনলাইনে ওদের পরীক্ষা হল। এর মধ্যে এম এ পড়ার এন্ট্রান্স হল বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, সব কটা জায়গায় ফার্স্ট লিস্টে অয়ন্তিকা নির্বাচিত হল। কিন্তু ওদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা না হওয়াতে ও ভীষণ অনিশ্চয়তায় ভুগতে লাগল, কারণ পরীক্ষা হয়ে তার রেজাল্ট না বেরোলে ও কোথাও ঢুকতে পারবে না উচ্চশিক্ষার জন্য । ভীষণ ডিপ্রেসেড হয়ে পড়ল ও। ওর খালি মনে হতে লাগল যে ওর পড়াশোনার আকাশটা দুঃস্বপের কালো মেঘে ঢেকে গেছে।

শেষে ওদের রেজাল্ট বেরোল মহাঅষ্টমীর দিন, অয়ন্তিকা ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে পাশ করল মনোস্তত্ত্বতে আর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বাইরের ইউনিভার্সিটি ওকে তাদের এম এ ক্লাসের জন্য সিলেক্ট করে ক্লাসে জয়েন করার মেল পাঠিয়ে দিল। এই সিলেক্টেড হবার মেলটা দীর্ঘ চার বছর সময় পরে অয়ন্তিকার কাছে যেন এক মুঠো রোদ হয়ে ওর জীবনের এল ওই কালো মেঘে ঢাকা দিনগুলোর অধ্যায়ের পরে। ও জয়েন করল ওই ইউনিভার্সিটির অনলাইন ক্লাসে এবং ভীষণভাবে সমাদৃত হল সেখানে, এখন সামনে ওর এম এর ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষার প্রস্তুতি যেটা ফেব্রুয়ারীতে হবে, তারপরে এম ফিল, ডক্টরেট করে পোষ্ট ডক্টরেট করবে ও, এর মধ্যে নেট দিয়ে একটা চাকরি নিতে হবে, নিজের প্রতি আস্থা যেন ফিরে পাচ্ছে ও। এই চারবছরের সময়টা ওকে সারাজীবনের জন্য অনেক শিক্ষা দিয়ে গেল। আজ জীবনের এই সময়টায় দাঁড়িয়ে ভাবছে অয়ন্তিকা সত্যিই তাহলে ওর জীবনে কালো মেঘের দিন কেটে গিয়ে এই সাফল্যের সূর্যোদয় হল এক মুঠো রোদের উষ্ণতা ছড়িয়ে!!!

॥প্রপোজ॥

একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হিউমান রিসোর্স এক্সিকিউটিভ দিশানি, অরিন্দম একই কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার, অনিকও মার্কেটিং এরই ছেলে। একই অফিস তিনজনের। আজকে অনিকের জন্মদিন, অফিসে খুব মজা করে সেটা সেলিব্রেশন হল, দিশানি অন্য ডিপার্টমেন্টের হলেও ওকেও ডেকে নিয়ে গেছিল ওরা। ছুটির আগে পাঁচটার সময় অনিক এসে বলল যে ও আজকে ওর বাড়িতে সারপ্রাইস বার্থডে পার্টি থ্রো করছে যেখানে দিশানিকেও ও ইনভাইট করছে।

দিশানি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান, বাবা কাস্টমস অফিসার আর মা একটা হাই সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ান। মা বাবার খুব আদরের সন্তান সে। আজকে অফিস থেকে বেরোতে দেরী হয়েছে, তাই খুব তাড়াহুড়ো করে অফিস থেকে বেরিয়ে দিশানি অনিকের জন্য একটা ভালো দেখে শার্ট কিনল গিফট দেবে বলে ওয়েস্টসাইড থেকে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি এল। নিজের বাড়িতে গিয়ে চেঞ্জ করে ফ্রেশ হয়ে নিল, তারপরে নিজের প্রিয় রোস পিঙ্ক কালারের পিওর সিল্কটা পরে সুন্দর করে সেজে বেরোল অনিকের বাড়ির উদ্দেশ্যেএকটা উবার ডেকে নিয়ে। রাস্তায় জ্যাম কাটিয়ে অনিকের রাখা সারপ্রাইস বার্থডে পার্টিতে আরো একটু দেরী হয়ে গেল পৌঁছতে দিশানির। দিশানি যখন অনিকের বাড়িতে পৌঁছলো দেখল ঘড়িতে রাত আটটা তখন। অনিকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখল দিশানি কেক কাটার তোড়জোড় চলছে সেখানে। ঘরের কোণে একটা বড়ো লাল গোলাপের বোকে রাখা রয়েছে দেখল দিশানি, ও ভাবল কেউ হয়তো অনিকের গিফট হিসেবে এনেছে। অন্য অনেক অফিস কলিগের সঙ্গে অরিন্দমও উপস্থিত সেখানে যথারীতি। দিশানি অরিন্দমকে পছন্দ করে মনে মনে কিন্তু মুখ ফুটেকখনো ওকে বলেনি সে কথা। অরিন্দমের সামনে গেলেই একরাশ লজ্জা ঘিরে ধরে সুন্দরী দিশানিকে, অসম্ভব ভালো বক্তা ওর সব ভাষা যেন ফুরিয়ে যায় অরিন্দমের সামনে।

ক্যান্ডেল জ্বেলে ওয়েল ডেকোরেটেড ঘরটাতে অনিক কেক কাটা হল, হাততালি দিয়ে সবাই উইশ করল। দিশানি অনিককে ওর গিফটটা দিয়ে শুভেচ্ছা জানাল। অনিক দিশানির দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল দেখল দিশানি। কেক কাটার পরে সবাইকে কেক ডিস্ট্রিবিউট করছিল অরিন্দম আর অনিক। সেটা করতে করতে হঠাৎ অরিন্দম দিশানির সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে ওর ট্রাউসারের পকেট থেকেএকটা আংটি বের করল আর ঘরের কোণে রাখা গোলাপফুলের বোকেটা ওর হাতে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। তারপর সকলের সামনে ওকেই প্রপোজ করে বসল বোকের থেকে একটা গোলাপ নিয়ে অরিন্দম যখন, তখন দিশানি নিজেই ভীষণ সারপ্রাইসড। সারপ্রাইস পার্টিতে এসে ও নিজেই সারপ্রাইসড হয়ে গেল। প্রাথমিক চমকের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে সব দ্বিধা কাটিয়ে দিশানিও ওর পছন্দের পুরুষ টল ডার্ক হ্যান্ডসম অরিন্দমকে নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত করে ফেলল আর এই প্রথম সবার সামনে অরিন্দমের হাতের ওপরে নিজের হাতটা রেখে জীবনের সামনের দিনগুলো ওর সঙ্গে চলার অঙ্গীকার করল। অনিক আর বাকী সব নিমন্ত্রিতরা খুব এনকারেজ করে ওদের গ্রিট করল। দিশানি একরাশ ভালোলাগা আর অরিন্দমের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে বেরোল আজ অনিকের পার্টি থেকে অরিন্দমের হাত ধরে সারপ্রাইসড আর হ্যাপি হয়ে।

॥কাঁটা চচ্চড়ি॥

আজকে ঝুনাইয়ের অন্নপ্রাশন। বাড়ির প্রথম মেয়ে, আর সুনন্দা আর অর্পণের তো নয়নের মণি ঝুনাই, তারপর অফিসের থেকে মেডিকেলের টাকাটাও পেয়ে গেল বলে অর্পণ বেশ বড়ো করেই অন্নপ্রাশনের আয়োজন করল। অর্পণের মা, বাবা, বোন, শ্বশুড়বাড়ির লোকজন ছাড়াও বহু আত্মীয় স্বজনকে বলেছে। না, ক্যাটারার দিয়ে করালো না খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা, অর্পণ নিজে বাজার করে ঠাকুরকে দিয়ে রান্না করালো আর পরিবেশন করলো বাড়িরই লোকেরা, বন্ধুরা। ভেটকি মাছের ফিশ ফ্রাইয়ের জন্য অরিজিনাল ভেটকি কিনে তার ফিলে করিয়ে নিল, বড়ো গলদা চিংড়ির মালাইকারি, ডিমভর্তি পার্শে মাছের ঝাল, ভেটকির পাতুরি আর চিকেনের কষার সঙ্গে সাদাভাত ভালো চালের, সোনামুগের ডাল, শেষপাতে আমসত্ত্ব খেজুরের চাটনি, দই আর রসগোল্লা আর সন্দেশ, মোটামুটি এই মেনু। লোকজন খেয়ে খুব খুশি হল।

ভেটকি মাছের ফিলে কাটিয়ে কাঁটাগুলো আর মাথাগুলো নিয়ে এসেছিল অর্পণ। পরেরদিন তাই দিয়ে কাঁটা চচ্চড়ি হল বড়ো কড়াইয়ের এক কড়াই। অর্পণের মা বলল অর্পণ নাকি খুব ভালোবাসে কাঁটা চচ্চড়ি। সুনন্দার ভাবল মা নিশ্চয় তুলে রাখবে অর্পণের জন্য। অর্পণের সেদিন অফিস, দুপুরে খেতে বসল শাশুড়ি, শ্বশুর, ছোট দেওর, ননদ, সুনন্দা সবাই মিলে। সবাইকে শাশুড়ি কাঁটা চচ্চড়ি দিলেন পাতে পাতে, মাছের তেল মাথা দেওয়া চচ্চড়ির অপূর্ব স্বাদ হয়েছে।

সবাই হুস হাস করে খেতে লাগল, সুনন্দার শাশুড়ি, শ্বশুর বয়স্ক মানুষ, অল্প খেয়ে উঠে পড়েছেন। সুনন্দার বিবাহিত ননদ আর বিবাহিত দেওর দুজনে খাচ্ছে। কড়াই থেকে চচ্চড়ি নিচ্ছে আর খাচ্ছে, খেতে খেতে হঠাৎ শাশুড়ির খেয়াল হল যে কাঁটা চচ্চড়ি প্রায় শেষ, তিনি এসে ছোট একটা বাটিতে তাড়াতাড়ি তুলে রেখে সুনন্দার হাতে দিয়ে সরিয়ে রাখতে বললেন। সুনন্দা তাই করল। রাত্রে খেতে বসে অর্পণ কাঁটা চচ্চড়ির কথা বলতে ওকে সেই সরিয়ে রাখা ছোট বাটির কাঁটা চচ্চড়ি সুনন্দা দিল। অর্পণ খুব অবাক হয়ে বলল, “অতটা কাঁটার এইটুকু চচ্চড়ি হল?” সুনন্দা বলল, “ভাই আর বোনে মিলে শেষই করে দিচ্ছিল, মা গিয়ে এটুকুই সরাতে পেরেছেন।” অর্পণ বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হল।

এরপরে অনেক দিন চলে গেছে, ঝুনাই এখন এম এ পড়ে। আজকে সুনন্দা কাঁটা চচ্চড়ি করেছে, খেতে বসে অর্পণ শুধু কাঁটা চচ্চড়ি দিয়েই পুরো ভাত খেল, ওদের কারুরই আজকে আর অন্য তরকারি লাগলোই না ওই কাঁটা চচ্চড়ি ছিল বলে। আজকে সুনন্দা ঝুনাইকে এতদিন পরে ওর অন্নপ্রাশনের পরেরদিনের ঘটনাটা বলে বলল, “জানিস তো, সেদিনের পরে যতবার কাঁটা চচ্চড়ি করেছি শুধু মনে হয়েছে দুটো প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের অবিবেচনার কথাটা।” শুনে অর্পণ বলল, “ওসব মনে রেখো না, রাখলে তুমিই সামনে এগোতে পারবে না।” সুনন্দা বলল, “না, ক্ষমা করে দিয়েছি ওদের, কিন্তু মনে রয়ে গেছে ওদের সেই ব্যবহারটা। আজকে এই একই কাজ তুমি বা আমি করলে ওরা কী ক্ষমা করত? মানুষের আচরণ তার চরিত্রের পরিচায়ক, তাই না।” অর্পণ চুপ করে গেল আর ঝুনাই মাকে সমর্থন করল।

॥নষ্ট দাম্পত্য॥

বি এ ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগে আগে বিয়ের ঠিক হল সোহিনীর, মা বাবার দেখাশোনা পাত্র, পিসতুতো দিদি সম্বন্ধ আনলো। পিসতুতো দিদি রাখির বন্ধু অনিমাদির ভাই, পিসতুতো দিদির কাছে সোহিনীর ছবি দেখে ভালো লেগেছে। তিন ভাইয়ের বড়ো এই অনিমাদি রাখিদির বন্ধু ছিল, আর যার সাথে বিয়ের কথা হচ্ছে সেই মুরলীধর বা মুরলীর ছিল আবার তিন ভাইয়ের সকলের ছোট, বাবার বয়স হয়েছে ভালোই, মা মারা গেছেন বছর পাঁচেক। বড়ভাই ধীরেন্দ্র বিবাহিত এবং এক কন্যার বাবা, মেজভাই সমরেন্দ্রও বিবাহিত, তারও সবে একটি মেয়ে হয়েছে আর ছোটো এই মুরলীধর, এদের পারিবারিক রঙের ব্যবসা, আরমেনিয়ান স্ট্রিটে দোকান আছে আর মুরলীধর চেষ্টা করছে নিজের কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা দাঁড় করাতে। মুরলীর সাথে সোহিনীর প্রায় বারো বছরের বয়সের তফাৎ। মুরলীদের বেলঘরিয়াতে বাইশ কাঠা জমির ওপরে বাগান, পুকুর আর মন্দিরসহ নিজেদের বিরাট বাড়ি, যে বাড়ি দেখে এসে সোহিনীর বাবা অনিলবাবু একদম অভিভূত হয়ে গেছেন। মুরলী পড়াশোনা ব্যাপারটা একটু এড়িয়েই চলে, কারণ বহু চেষ্টা করেও বি কমের গাঁটটা সে পেরোতে পারেনি।

সোহিনীরা দুই বোন, সোহিনী বড়ো আর মোহিনী ছোট, সোহিনীর চেয়ে বারো বছরের ছোট। সোহিনী কিন্তু পড়াশোনা ভালোবাসে, নিজে ভালো গায়, একটু আধটু লেখালেখি করে। সোহিনীর কিন্তু এক্ষুনি বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে ছিল না, তার আরো পড়বার ইচ্ছে ছিল, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছে ছিল। সোহিনী বড়ো হয়েছে রাজ্যের বাইরের একটি শিল্প নগরীতে, পড়েছে কো এড স্কুলে, বেড়েছে স্বাধীন ভাবে আর মননে গড়ে উঠেছে একটি আদ্যন্ত পরিশীলিত মন। কো এডে পড়ার দরুণ তার প্রচুর ছেলে বন্ধু আছে যারা প্রয়োজনে- ওকে লেখাপড়ায় সাহায্য করা থেকে শুরুকরে কোচিং এ বেশি রাত হয়ে গেলে বাড়িতে পৌঁছে পর্যন্ত দিয়ে যায়। তাই ছেলে বন্ধুদের সাথে ও ভীষণ সহজ, বরং মেয়ে বন্ধুদের অনেকের মধ্যেই ও সংকীর্ণতা দেখেছে, তাই মেয়েদের ও একটু এড়িয়েই চলে। কলকাতায় এসেছে সোহিনী স্নাতক স্তরে পড়তে। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়েছে সোহিনী , আবার ইলেক্টিভ বাংলা আর এডুকেশন তার পাসের বিষয়। বাংলাতে ও বরাবরই ভালো, উচ্চ মাধ্যমিকে মা বাবার ইচ্ছেতে সায়েন্স নিয়ে পড়তে গিয়ে ওর পছন্দের বিষয় বাংলা বা ইতিহাসে অনার্সটা ওর স্নাতক স্তরে নেওয়া হল না। পরীক্ষার প্রস্তুতির মাঝে ওর মুরলীর সঙ্গে বিয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেল। তারপরে বার দুয়েক হবু বর মুরলীধর এসে ওদের বাড়িতে ঘুরে গেল, ওর কী ধরণের কসমেটিক্স চাই জানতে চেষ্টা করল, কিন্তু সোহিনী সাজতে ভালোবাসলেও কসমেটিক্স খুব কমই ব্যবহার করে, তার একটা বড়ো কারণ সোহিনীর কসমেটিক্স তেমন লাগে না। তাই সোহিনী বলেই দিল ওর কসমেটিক্স লাগবে না। তার দুধে আলতা গায়ের রং, দাগহীন মসৃণ ত্বক, রেশমের মতো লম্বা ঈষৎ বাদামি চুল আর লম্বা ছিপছিপে চেহারা আর কাটাকাটা চোখ মুখ এমনিতেই অনেকের মধ্যে তাকে আলাদা প্রাধান্য দেয়, আর সাজলে তো আর কারুর দিকে নজরই পড়ে না, শুধু তাকেই সবাই ঘুরে ঘুরে দেখে। কলকাতায় এসে ওরা যে বাড়িতে ভাড়া আছে, সেই বাড়ির ল্যান্ডলর্ডের স্ত্রীর সম্পর্কিত ছোট দেওর যে নিজে এস ডি ও তার সোহিনীকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেছিল, ওরা কাঠবাঙ্গাল বলে মা বাবা এগোলোই না, অথচ সেই বাঙ্গাল বাড়িতেই বিয়ে দিচ্ছে এখানে।

বিয়ের আগে “কিছুই লাগবে না, কিছুই লাগবে না” বলে অনিলবাবুর কাছ থেকে সবই নিয়েছে এরা, খাট আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, কুড়ি ভরি সোনার গহনা, ফ্রিজ, টিভি সোফাসেট, তিরিশটা নমস্কারী শাড়ি। অনিলবাবু বড়োমেয়ের স্বাচ্ছন্দের কথা ভেবে সবই দিলেন সাধ্য মতো। বিয়ে হল শ্রাবণের একটা দিনে। বরবেশে মুরলীর সঙ্গে শুভ দৃষ্টির সময় সোহিনী মুরলীর চোখে মুখে লোভ দেখতে পেল। ফুলশয্যাতে ঢুকে মুরলী প্রথমেই নিজেকে অনাবৃত করে জিজ্ঞেস করল সোহিনীকে নিজের দিকে দেখিয়ে, “দেখো সব ঠিক আছে তো?” সোহিনী হতবাক হয়ে কিছু বলার সময় পেল না, মুরলী দখল নিল ওর কুমারী শরীরটার। সোহিনী নিজের ভালো না লাগাটা প্রাণপনে চেষ্টা করতে লাগল সাংসারিক কাজের মধ্যে ভুলে যেতে। কিন্তু রাত্রি আসলেই আর ছুটির দিনে দুপুরে চলে ওই শরীরের দখল নেবার প্রবণতার নামে পাশবিকতা। এর মধ্যে ওরা অষ্টমঙ্গলাতে গেল সোহিনীর বাবার কর্মস্থলে যেটা সোহিনীর বেড়ে ওঠার জায়গাও বটে। সেখানে অনিলবাবু একটা ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন মেয়ে জামাইকে সকলের সাথে পরিচিত করাতে। এই অনুষ্ঠানের আগে পরে সোহিনীর সব বন্ধুরা এলো দেখা করতে, স্কুলের বন্ধু দেবদীপ ওকে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে দেবদীপের মা ডেকেছেন বলে, সোহিনী নিজের সাইকেল নিয়ে গিয়ে দেখা করে এলো। আসার পর থেকে সোহিনী খেয়াল করল মুরলী যেন কেমন একটু বেসুরে বাজছে। ও বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল কেন? মুরলীর সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা করতে পারেনা সোহিনী, কারণ মুরলী ব্যবসা, খাওয়া আর শরীর ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের খবরই রাখে না। আসলে দেবদীপের সঙ্গে যে সোহিনী গেছিল দেবদীপের বাড়িতে এটা মুরলীর মনে রোপন করল সন্দেহের বীজ। মুরলী ধরে নিল নিশ্চয় দেবদীপ আর সোহিনীর মধ্যে কিছু একটা আছে, যেটা ওরা ওকে জানাতে চায় না।মুরলী ভুলে গেল দেবদীপ সোহিনী আর মুরলী দুজনকেই যেতে বলেছিল, কিন্তু মুরলী শরীর ঠিক না থাকার অজুহাতে যায়নি, মুরলী ভেবেছিল সোহিনীও যাবে না, কিন্তু সোহিনীর সাথে দেবদীপের মায়ের এমনই সম্পর্ক যে সোহিনী গেছে নিজের আত্মার আত্মীয় মনে করে দেবদীপের মায়ের আমন্ত্রণে। সত্যিই দেবদীপের মা সোহিনীকে নিজের মেয়ের মতোই দেখেন। পরেরদিন অনুষ্ঠান হল, তার পরেরদিন মুরলী অনিলবাবুর কাছে বলল যে তিনি যেন ওকে টাকা দিয়ে ওর কন্ট্রাক্টরী ব্যবসা দাঁড় করাতে সাহায্য করেন। চাকুরীজীবি অনিলবাবু খুব আতান্তরে পড়লেন, সদ্য ধার দেনা করে দিয়ে থুয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন, এহেন প্রস্তাবের জন্য উনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, তাছাড়া তাঁর এতটা আর্থিক সঙ্গতিও নেই, তাঁর ছোট মেয়ের ভবিষ্যৎও ভাবতে হবে। ছোট মেয়ে পড়াশোনার কথাটা তিনি বলতেই মুরলী বলল যে মোহিনীকে কনভেন্ট ছাড়িয়ে স্থানীয় মিডিয়ামের সরকারি স্কুলে দিলে তো খরচ কমে যাবে। এবারে অনিলবাবু উপলব্ধি করলেন যে সোহিনীর বিয়েটা অপাত্রে দেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু প্রকাশ করলেন না পাছে সোহিনী কষ্ট পায় ভেবে।

অষ্টমঙ্গলা সেরে শ্বশুরবাড়িতে ফিরল সোহিনীরা। সারাদিন সোহিনী রান্নাবান্নায় সাহায্য করে বড়ো জাকে, রান্না করে রান্নার লোক, কিন্তু শ্বশুরকে খেতে দেয় সোহিনী, শ্বশুরমশাই দীনেনবাবু নির্বিরোধী ভালো মানুষ, রামঠাকুরের দীক্ষিত, বাড়ির সকলেই রামঠাকুরের কৈবল্যধামে দীক্ষিত, বাড়ির মন্দিরে তাঁরই পুজো হয়, কিন্তু লোকগুলো ভালো নয় বাড়ির। এদের দেখে সোহিনীর ধারণা হয়ে গেল রামঠাকুরের সব দীক্ষিতরাই বুঝি এমন হয়। সোহিনীর বারান্দায় বেরোনো বারণ, ছাদে ওঠা বারণ, নীচে নামা বারণ, সারাক্ষণ ঘোমটা টেনে থাকতে হয় বাড়িতে ওকে। বড়ো বৌয়ের ক্ষেত্রে নিষেধ কম, যেহেতু শাশুড়ি নেই,কিন্তু সোহিনীর ক্ষেত্রে নাকি ভাসুর, শ্বশুরের সামনে মাথার কাপড় ফেলে ঘুরে বেড়ানো অসভ্যতা। অষ্টমঙ্গলা থেকে ঘুরে এসে মুরলী সোহিনী

বিয়েতে যা ক্যাশ টাকা পেয়েছিল সেটা দিয়ে একটা জয়েন্ট একাউন্ট খুলল ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে কিন্তু তার চেক বই, পাসবই নিজের হেফাজতে রেখে দিল। আর সোহিনীর সমস্ত গয়না খুলিয়ে নিয়ে চলে গেল, লকারে রাখবে বলে। প্রথম মাসে সোহিনীকে দুশো টাকা হাত খরচের টাকা দিল, সেটা আবার সোহিনীর মা বাবাকে শুনিয়েও গেল। এর মধ্যে সোহিনীর গ্রাজুয়েশনের রেজাল্ট বেরোল, সোহিনী রেজাল্ট জানতে কলেজে যেতে চাইলে মুরলী বলল, "কী হবে রেজাল্ট জেনে? পাশ করলেও যা হবে, ফেল করলেও তাই হবে।" সোহিনী স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল।

এর মধ্যে সোহিনীর নজরে পড়ল বেশ কয়েকবার মুরলী কাজ সেরে বিকেলে ফিরলে সোহিনী খেতে দিতে চাইলে ওকে বলে যে তখন খাবে না, ঘর থেকে বেরিয়ে বৌদিকে বলে খেতে দিতে। বৌদির হাতের খাবারে নাকি স্বাদ বেড়ে যায়, অথচ খাবারটা করে রাখে সোহিনী। একদিন সোহিনী নীচের ঠাকুরের মন্দির থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখল মুরলী ডাইনিং টেবিলে বসেছে, তার চোখে কিছু পড়েছে, আর তার বৌদি তার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখে ফুঁ দিচ্ছে, দৃশ্যটা কেন যেন সোহিনীর ভালো লাগল না। মুরলীর বৌদি মুরলীর প্রায় সমবয়সী, তার সঙ্গে এহেন আচরণ দেখেও নিজের মনের সন্দেহ টাকে সে এড়াতে চাইল। আর একদিন ছুটির দুপুরে খাওয়ার পরে সোহিনী নিজের ঘরে বসে বইপত্র নাড়াচাড়া করছিল মগ্ন হয়ে , হঠাৎ জোরে হাসির আওয়াজে ওর মগ্নতায় চিড় ধরল, ও উঠে দেখতে গেল কোথা থেকে হাসির আওয়াজ আসছে, দেখল গিয়ে মুরলী বৌদির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে কী কথায় দুজনেই হেসে যাচ্ছে। এবারেও সোহিনী ওদের জানতে না দিয়ে সরে এলো, ধীরে ধীরে খেয়াল করল সোহিনী মুরলী ওর রান্না, ওর পোশাক, ওর আচরণ সব কিছুতেই খুঁত ধরে আর তুলনাটা চলে হয় ওর বৌদির সঙ্গে নয় ওর বড়লোক শ্যামবাজারে থাকা কাকিমার সঙ্গে। দিনে দিনে এগুলো বাড়তে লাগল।

এর মধ্যে সোহিনীর মা বাবা এলেন একদিন পুজোর তত্ত্ব নিয়ে, মুরলী সোহিনীর মায়ের কাছে বলতে বসল সোহিনী কতটা নিষ্কর্মা আর নির্লজ্জ। সোহিনীর এবারে ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগল। এর মধ্যে ওর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাকুর ভাসান দেখা নিয়ে প্রচন্ড অশান্তি শুরু করল মুরলী আর ওর দাদা বৌদি, তিনদিন ওকে খেতে দিল না, ওর জ্বর এসে গেল মানসিক চাপে। মুরলী আর সোহিনীর ঝগড়া হলেই মুরলী ওর দাদা বৌদিকে টেনে নিয়ে আসে ওর সালিসি করতে, সেদিনও তেমন ঘটতে সোহিনী সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল ওর বড়ো জাকে যে তাহলে কী ওরা ওকে চলে যেতে বলছে, ওরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ওকে বলল চলে যেতে। ও প্রায় এক কাপড়ে ওর অনার্সের বই কটা স্যুটকেসে ভরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মুরলীকে বলল ওর গাড়ি ভাড়ার টাকা দিতে, মুরলী সিঁড়ি ওপর থেকে কুড়িটা টাকা অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরে ছুঁড়ে দিল।

সোহিনী ফিরে গেল অনিলবাবুর কর্মস্থলে, গিয়ে দেখল তারা সবাই কলকাতায় এসেছে। ও যখন ভাবছে ফিরে যাবে তখন পাড়ার মধ্যেই থাকা দেবদীপের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, ওকে দেবদীপ ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল। দেবদীপদের বাড়িতে সেদিন রাতে থেকে পরেরদিন কলকাতায় আসার আগে সোহিনী ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখল বাবা অনিলবাবু ফেরত এসেছেন। ওর স্যুটকেস দেবদীপ পৌঁছে দিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। ও বহুদিন পরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল অনিলবাবু অফিসে বেরিয়ে গেলে ফ্রিজে মায়ের রান্না করা যা ছিল তাই

খেয়ে।

ফিরে আসার একমাসের মধ্যে সোহিনীর কোনো খোঁজ করল না মুরলীদের বাড়ি থেকে, একমাস পরে এলো একটা চিঠি মুরলীর কাছ থেকে যেখানে মুরলী লিখেছে যে সোহিনী নাকি ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে প্লেজার ট্রিপে যাবে বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। অনিলবাবুর উকিল বন্ধু চিঠিটা দেখেই বললেন যে মুরলীরা সোহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ আনবার জন্যই এমন চিঠি দিয়েছে ।দীর্ঘ টানা পোড়েনের পরে সোহিনীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেল মুরলীর কারণ মুরলীর মনে সন্দেহের সেই যে বিষটা ঢুকেছিল দেবদীপ আর সোহিনীকে জড়িয়ে, সেটাকেই ও সত্যি ধরে তিল থেকে তাল ভেবে কল্পনায় সোহিনীর সঙ্গে দেবদীপের অনৈতিক সম্পর্ক তৈরী করে ফেলল যদিও এই আড়াই মাসে সোহিনীর সাথে দেবদীপের দেখা হয়েছে শুধু সেই অষ্টমঙ্গলার সময়ে আর সোহিনীর সঙ্গে মুরলীর কালচারের ভেদ তো ছিলই, সোহিনীও কিন্তু মুরলীর সঙ্গে ওর বৌদির অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতাকে স্বাভাবিক ভাবতে পারেনি, ভাবা সম্ভবও ছিল না, ফলে কুটিল সন্দেহের বিষের জ্বালায় নষ্ট হয়ে গেল ওদের দাম্পত্য। সোহিনীর গয়না, শাড়ি কোনো কিছুই ফেরত দিল না মুরলী আর বিচ্ছেদের ছমাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করল, এইবারে জিনিসপত্রের সঙ্গে দুলাখ টাকা ক্যাশ নিয়ে। আর সোহিনী স্নাতক স্তরে ভালো রেজাল্ট করেই ছিল, এরপরে এম এ পাশ করে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ঢুকল ইনকাম ট্যাক্সের আধিকারিক পদে। কিন্তু সেই সন্দেহের বিষে শেষ হয়ে যাওয়া নষ্ট দাম্পত্য মুরলী আর সোহিনীর জীবনের একটা অমীমাংসিত অধ্যায় হয়েই রয়ে গেল আজীবন।

(**এক আত্মীয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে আমার কল্পনার মিশেলে লেখা)

॥সোহিনীর অসহায়তা॥

আমি সোহিনী ব্যানার্জী, নষ্ট দাম্পত্যের অবসানের হলে বহু সংগ্রামের পরে প্রথমে একটা ছোট প্রাইভেট ফার্মে চাকরি পেলাম আমি, সেখানে আবার সত্তর বছরের লম্পট বসের আন্ডারে কাজ করতে হবে আমাকে। একদিন কাজের নাম করে চেম্বারে ডেকে নিয়ে সেই বুড়ো আমাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। তার আগে আমাকে অবশ্য বলেছে সেই বুড়ো যে আমার কোনো অভাব রাখবে না সে, আমার যা যা দরকার যেন ওই বুড়োকেই বলি। কিন্তু আমার গাটা গুলিয়ে উঠেছে এই প্রস্তাবে। তাই বসের চেম্বারের দরজাটা খুলে রেখে বেরোনোর আগে সপাটে একটা চড় মেরে বেরোলাম ওই বুড়ো বসের গালে আর টেবিলে এসেই রেসিগ্ন্যাশন লেটার লিখে জমা দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে এলাম। এরপরে একদিন অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে দেখে জনৈক CRS থেকে একটা ইন্টারভিউয়ের চিঠি এসেছে। দেখলাম CRS. লেখাটার তলায় “a Govt. Enterprise” লেখা রয়েছে ছোটো ছোটো করে। কবে যে এখানে দরখাস্ত করেছিলাম মনে নেই। ইন্টারভিউ হবে রিপন স্ট্রিটের একটা ঠিকানায়। নির্দিষ্ট দিনে গেলাম সেখানে ইন্টারভিউ দিতে, দেখি হাজার পাঁচেক ক্যান্ডিডেট, সবায়ের অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমি তো দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেছি। প্রথমে রিটেন হল দুঘন্টার, দিয়ে বেরোতে যাব ওদের HR বলল আধ ঘন্টা ওয়েট করে যেতে, ওরা রেজাল্ট বলে দেবে ওর মধ্যে, অগত্যা বসলাম। আধঘন্টা পরে ওরা দশজনের নাম ডাকলো যারা নির্বাচিত এবং যাদের কম্পিউটারে পরীক্ষা দিতে হবে। দেখি তার মধ্যে আমি আছি, কম্পিউটারে টেস্ট দিলাম, দিয়ে চলে এলাম। এটার রেজাল্ট বেরোবে জানুয়ারি মাসে। আমার তখনকার অফিস ছিল থিয়েটার রোডে। জানুয়ারি মাসে যেদিন রেজাল্ট বেরোবে গেলাম ক্যাম্যাক স্ট্রিটের অফিসে। নিচে সিকিউরিটির লোক বসে আছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম যে রেজাল্ট কোথায় দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আমাকে আগেই বলে দিলেন যে আমার নাম নেই। এবার আমি হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসছি, দেখি তাঁরা একটা লিস্ট চেপে ধরে আছেন তাঁদের টেবিলে, সেই লিস্টের প্রথম নামটা আমার। আমি সেটা তাঁদের দেখাতেই তাঁরা আমায় যেন কিছুই হয়নি এইভাবে একটা ব্যক্তিগত তথ্যের ফর্ম দিলেন ভর্তি করতে। সেটা ভরে তাঁদের হাতে দিতে আমাকে দোতলাতে রিসেপশনে পাঠালেন।

সেখানে HR আমাকে বললেন আরো তিনটে ইন্টারভিউ হবে, একে একে হলোও তাই, জিএম শেষদিন ইন্টারভিউ নিয়ে যে কথা আমায় বললেন সেটা হল তার দুদিন পরে মেডিকেলের জন্যে যেতে। এদিকে এঁর মধ্যে আরো তিনটে জায়গা থেকে জয়েনিং এর চিঠি এসেছে বাড়িতে, আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, এএনজেড গ্রিন্ডলেস ব্যাংক আর আসাম ফ্রন্টিয়ার টি, শেষেরটাও Govt. undertaking। বাড়িতে বাবা বললেন CRS এর টাতেই জয়েন করতে। সেই মত জয়েন করলাম CRS LTD. দোসরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ তে। ঢুকলাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, ঢুকেই যেতে হল পার্ক হোটেলে TQM ট্রেনিং এ। তারপরে পুরো দস্তুর অফিস শুরু হল। এই চাকরিটা আমার খুবই দরকার ছিল, বাবা অবসর নিয়েছেন, মায়ের সুগার আর বোন এখনো স্কুলে পড়ছে। বাবা নিজের নির্বুদ্ধিতায় প্রচুর টাকা নষ্ট করলেন, তাই সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ওপরে।

আমি ঢুকেছি অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্টে, যেহেতু ওর আগের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল তাই আমাকে দুটো গ্রেড ওপরে

পোস্টিং দিয়েছে কোম্পানি, কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার অসীমবাবু সহৃদয়, ভালো মানুষ, ওঁর মেয়ে একই অফিসে আছে, সে আমার থেকে বড়ো, লাইব্রেরি দেখে। অসীম বাবু আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন জয়েনিং এর আগে, উনি আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন, সেটা আমার ডিপার্টমেন্টের সকলের খুব ঈর্ষার বিষয়। আমাকে যে দুটো গ্রেড ওপরে পোস্টিং দিয়েছে সেটা আরেকটা ঈর্ষার বিষয় আমার কলিগদের। ছোট কোম্পানি বলে কাজের চাপ আছে, স্যালারি খুবই ভালো দেয়, কিন্তু অফিসের লোকগুলোর সারাদিনে অন্য কাজের থেকেও ইন্টারেস্ট বেশী অন্যের ব্যাপারে। আমার যে ইমিডিয়েট বস সেই অনিকবাবু নিজে আন্ডার গ্রাজুয়েট, বেশ বয়স্ক কিন্তু তাঁর মহিলা সংক্রান্ত বেশ ভালো রকমের আলুর দোষ আছে।

সব ঠিক ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে শিখলাম কর্পোরেট সেক্টর কি জিনিস, জীবনের সহজতা, সারল্য হারিয়ে যেতে লাগল। অফিসের বাইরে অন্য কিছু করাটা মানে গান, লেখালেখি এইসব দেখা হত অপরাধের চোখে। অফিসে ঢোকার সময় ছিল নটায়, কিন্তু খাতায় কলমে সাড়ে পাঁচটায় ছুটি বললেও ছুটির নির্দিষ্ট সময় নেই। অর্থাৎ বাড়ি ফেরার নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিল না। তার ওপরে ছিল নোংরা অফিস পলিটিক্স। আমার কলিগদের প্রথম থেকে ধারণা হয়ে গেল আমি কাউকে নিশ্চয় ধরে ঢুকেছি, সর্বক্ষণ নানান অছিলায় আমাকে ব্যতিব্যস্ত হতে হত। তার ওপরে আমার যিনি বস ছিলেন তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন নানাভাবে সমস্যা তৈরী করতে। বিকেলে বেরোনোর সময় হলেই বলতেন, “দাঁড়াও, আরেকটু ফাঁকা হোক বাসগুলো তারপরে বেরোবো”, সেই সময়টা সন্ধে সাড়ে সাতটার পরে। কারণে অকারণে চিঠি খেতাম শোকসের, কার সঙ্গে মিশব, না মিশব সেটাও বস ঠিক করে দেবেন। যাদের সাথে কাজ করতাম তারা আমার সামনে খুবই বন্ধুভাবাপন্ন দেখাত আর পেছনে নানান কদর্য ফন্দি করত আমাকে বিপদে ফেলার। ভাবটা এমন যেন আমি ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি। সব মিলিয়ে খুব দুর্বিসহ অবস্থা দাঁড়িয়ে ছিল। ছুটি নেওয়া যাবে না, ছুটি নেওয়া মানে রীতিমতো ক্রিমিনাল অফেন্স, একবার চারদিন অসুস্থ হয়েছিলাম, অফিসে খবর দেওয়া সত্বেও বাড়িতে অফিসের লোক চলে গেছিল দেখতে আমি সত্যি সত্যি অসুস্থ কিনা। কিন্তু মাইনেটা ভালো ছিল বলে ছাড়া হল না। বাড়ির অনেকখানি দায়িত্ব ততদিনে নিয়ে ফেলেছি আমি।

একদিন অফিসে গিয়ে শুনলাম সেদিন থেকে রবীন্দ্র জয়ন্তীর রিহার্সাল শুরু হবে, সাড়ে চারটের সময় বন্দো আসবে, আমাদের নতুন কয়েকজনকে বলা হল সাড়ে চারটেতে পাঁচতলায় ক্যান্টিন সংলগ্ন একটা ঘরে উপস্থিত থাকতে। আমরা কয়েকজন গেলাম, বসে আছি, প্রায় পাঁচটার সময় একজন লোক ঢুকলেন হাতে ব্যাগ নিয়ে, শুনলাম তিনিই বন্দো। তিনি ঘরে ঢুকে হারমোনিয়াম আনালেন, তবলাও এলো, এবার একে একে সকলের ভয়েস টেস্টিং হল। তারপরে তিনি আমায় দায়িত্ব দিলেন পরেরদিন রবীন্দ্রনাথের একশ তিরিশ বছরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটা গীতি আলেখ্য লিখে আনতে যেটাতে বিভিন্ন আবেগ ও ঋতুর সমন্বয়ে রবীন্দ্রসংগীতের সমাহারে ভাষ্য থাকবে। পরেরদিন সেটা লিখে নিয়ে গেলাম এবং দেখলাম রিক্রিয়েশন ক্লাবের সব কর্মকর্তাদের সেই স্ক্রিপ্ট আর গানের সমন্বয় ভীষণ পছন্দ হয়েছে। সেই মতো রিহার্সাল দিয়ে অনুষ্ঠান হল, আমি লিড সিঙ্গার ছিলাম, সঙ্গে মেল লিড ছিল জয়েন্দ্রদা, ভালো গলা, সুন্দর গান করেন, শুধু তালে একেবারে বেতাল। এরপরে দেখলাম আস্তে আস্তে অফিসের যে কোনো প্রোগ্রামে আমি আর বন্দো একদম অপরিহার্য হয়ে গেছি। বন্দো পুরো নাম শ্রীঅভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেশ গুণী এবং শিল্পী মানুষ, সংগীতের প্রতি ভীষণ একনিষ্ঠ,

বেহালা আর পিয়ানো বা কীবোর্ড দুটোই ভালো বাজান। অফিসের বহু মেয়ের আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ, মাথায় টাক আছে, কিন্তু কাটা কাটা চোখ মুখ, ভীষণ স্পষ্টবাদী এবং নির্ভীক মানুষ।নিজের পয়সায় অফিসের পরে পিয়ানো শেখেন স্যাম ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। সঙ্গীত অন্তপ্রাণ মানুষ, অফিস থেকে লোন নিয়ে রাচেলের পিয়ানো কিনেছেন, যে পিয়ানো সারা পৃথিবীতে তিনজনের কাছে আছে, সেই তিনজনের একজন উনি নিজে। বয়সে আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়ো। উনি অফিসের পলিটিকসের ব্যাপারে জানেন এবং আমায় নানা ভাবে পরামর্শ দেন কি ভাবে চলা উচিৎ সেই বিষয়ে। দেখতে দেখতে পুজো এলো, আমাদের অ্যানুয়াল ডে অক্টোবরে প্যারিশ হল ভাড়া করে অনুষ্ঠান হল, সেখানে আমি গান গাইলাম, আমার বোনকে নিয়ে গেছিলাম সেদিন, অনুষ্ঠানের পরে ডিনার সেরে বাড়ি গেলাম। আস্তে আস্তে মানিয়ে নিচ্ছি অফিসের পরিবেশের সঙ্গে। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে উনি আমার ঠিকুজিটা চাইলেন ওঁর বাবা যিনি জ্যোতিষ চর্চা করেন তাঁকে দেখাবেন বলে। একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জ্যোতিষে বিশ্বাসী ছিলাম।

দেখতে দেখতে এখানে ঢোকার একবছরের মাথায় বিয়ে হল অভিজিতের সঙ্গে, সন্তান এল, মা হলাম আমি। আমার একটা মেয়ে হল, আস্তে আস্তে সে স্কুলে যেতে আরম্ভ করল, প্রথমে টডলার স্কুলে, তারপরে বড়ো স্কুলে, দেখতে দেখতে এগারোটা বছর দিয়ে দিলাম এখানে, কিন্তু কোন প্রমোশন হল না। কারণ আমি অফিসে পলিটিক্স করতে পারিনা, আমি বসকে কাজের বাইরে সময় দিই না, আমার অফিস সংক্রান্ত কোনো পরকীয়া নেই, আমি এডমিনের আর কাস্টমার সার্ভিসের বিল প্রসেসিংয়ের অংশ কিন্তু আমাকে ঘুষ দেওয়া যায়না আর আমি স্পষ্টবাদী। কোনো কিছু রেখে ঢেকে বলিনা, করিওনা। ভেন্ডাররা অনেকেই অনেকসময়ে আমাকে ঘুষের কথা বলেছেন, কিন্তু আমি রাজি হইনি। আর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা আমায় নিয়ে যে আমি সাড়ে ছটার পরে অফিসে থাকি না।আমি বসেদের কোলে উঠে পড়তে পারিনা, বসের জন্য চা কফি বয়ে দিতে পারিনা, লেট আওয়ার্স থেকে পরচর্চা করে মাঝরাতে যাতায়াতের টাকা ক্লেম করে অন্যকে ল্যাং মেরে দিতে পারিনা। আর আমার প্রবল আত্মসম্মানবোধ আছে, আমি দয়া চাইতে পারিনা, তেল দিতে পারিনা।

কথায় বলে দোষে গুণে মানুষ। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু মানুষের দোষের জন্যে বা অসৎ মনোভাবের জন্যে অনেকসময় অন্য মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। সেই রকম দুজন কুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের কথা বলব।

প্রথম জন ছিলেন আমার কর্মক্ষেত্র CRS Ltd. এর প্রথমে জেনারেল ম্যানেজার বা GM, পরে সেই কোম্পানির CMD। আমি সেখানে ঢুকি ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, তখন সেখানকার GM ছিলেন শ্রীঅসিত কুমার রায়। অত্যন্ত সজ্জন, নিপাট ভদ্রলোক, এর হাতেই আমার রিক্রুটমেন্ট হয়। তার ছমাসের মাথায় অসিতদা রিটায়ার করেন, আসেন GM হয়ে শ্রীশম্ভু শেখর ঘোষ বা SSG। উনি আসার কিছুদিনের মধ্যে আমার প্রবেশন পিরিয়ড শেষ হলেও কনফারমেশনের চিঠি পাই না। এদিকে সদ্যবিবাহিতা আমি, বিয়ের পরে যেদিন জয়েন করি সেদিন অফিসে যাবার সময় আমার পা মচকায় মোক্ষমভাবে। সেই নিয়েই আমি অফিসে যাই, আমার বরও একই অফিসের কর্মী, ডিপার্টমেন্ট আলাদা। পায়ের যন্ত্রনা বাড়তে থাকায় আর পা ফুলে ঢোল হয়ে যেতে আমার ডিপার্টমেন্টাল হেড আমাকে বাড়িতে ফেরত পাঠান এবং বলে দেন যেন পা ঠিক না হলে জয়েন না করি, বাড়িতে এসে ডাক্তার দেখালে তিনি এক সপ্তাহ রেস্ট লিখে দেন। এই ঘটনা যেদিন ঘটে সেদিন ছিল সোমবার,

শুক্রবার আমাদের অফিসে একটা মিটিং ছিল, সেই মিটিংয়ের শেষে SSG আমার বরকে জিজ্ঞেস করেন আমি অফিসে আসছিনা কেন। আমার বর তাঁকে বলে আমার পায়ে চোট পাওয়ার কথা, সাথে সাথে এটাও বলে যে এসেই বা কি হবে, প্রবেশন পিরিয়ডে যারা ছুটি নিল সকলে কনফারমেশনের চিঠি পেয়ে গেল আর আমার কোনো ছুটি না নিয়েও কনফারমেশন হল না। পরের সোমবার আমি জয়েন করতে আমার ডিপার্টমেন্টাল হেড আমায় নিজের ঘরে ডেকে কনফারমেশনের চিঠিটা দেন। আমি তাঁকে বলি যে SSG কি আমার বরের কথায় ভয় পেয়ে চিঠিটা দিলেন কারণ চিঠির তারিখ হচ্ছে জানুয়ারি ৩১ আর আমায় চিঠিটা দিচ্ছে ফেব্রুয়ারী ২৪ তারিখে। এরপরে শুরু হয় অন্য সমস্যা, প্রথম থেকেই অফিসের তথাকথিত কিছু স্বনিযুক্ত অভিভাবকের আমার আর আমার বরের বিয়ে নিয়ে বিস্তর অসুবিধে ছিল, হঠাৎই রাতারাতি আমার বরকে ট্রান্সফার করা হয় SDF এর অফিসে। কারণ যেহেতু আমরা একই বিল্ডিংয়ে রয়েছি, তাই আমরা চা খেতে বা লাঞ্চ করতে যেতাম একসাথে যেটা অনেকেরই চক্ষুশূল ছিল। আমাকে আর আমার বরকে আলাদা আলাদা ডেকে কিছু লোক রীতিমতো প্রশ্ন করেন যে আমাদের লজ্জা করে না একসাথে ওঠাবসা করতে। অনেকেই ছিলেন অফিসে যাদের বাড়িতে বর বা বৌ থাকা সত্বেও অফিসে অন্য কারো সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত। আর SSG আমার বরের বসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আমাদের দুজনকে যেন একসাথে এক বাড়িতে উনি আর না দেখেন। এতো গেল আমার আর আমার বরের ব্যক্তিগত বিপর্যয়।

এবার ১৯৯৫ তে উনি GM হলেন, তারপরে তৎকালীন CMD শ্রীকুমারের বদান্যতায় কুমারের পরে হয়ে গেলেন CMD এবং ২০০০ সালের মধ্যে CRS র মত একটা গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং প্রফিট মেকিং অন্যতম নবরত্ন কোম্পানিকে নিজের পকেট ভরাবার জন্যে মাত্র একতৃতীয়াংশ দামে বেচে দিলেন ডাটা সন্স এর কাছে, তারপরেও তাঁর ইচ্ছে ছিল সেই বিক্রি হয়ে যাওয়া কোম্পানিতে তিনি সর্বেসর্বা হয়ে বসবেন। কিন্তু ডাটা এইবার তাঁর পশ্চাৎদেশে গুছিয়ে কয়েকটা পদাঘাত করে তাঁকে বের করে দিল। CRS হল A ডাটা সন্স এন্টারপ্রাইস, মাঝখান থেকে CRS এর কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে গেল, ডাটা নেবার পরে কিছু দুর্বৃত্ত সেখানে ঢুকল যারা ডাটার কলঙ্ক, তারা ঠিক করল যে লাভের টাকাটা সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে Profit Linked incentive হিসেবে প্রতিবছর বন্টন হত সেটা শুধুই CEO মিস্টার রিমোর একার পকেটে ঢুকবে যার পরিমান কয়েক কোটি টাকা আর অফিসের কর্মীদের সমস্ত সুযোগ সুবিধে গুলোর জন্য চালু হল Cost Crunch। কিছু সুযোগ সন্ধানী লোকের মাৎস্যন্যায় নীতির ফলে কিছু নিরীহ লোকের চাকরি গেল বা তারা বাধ্য হল চাকরি ছাড়তে নিজেদের সম্মান বাঁচাতে। তারও কিছু বছর পরে ২০১৫ তে TDR পুরোপুরি টেকওভার করল CRS, CRS নামটা কম্পিউটার আর IT ইন্ডাস্ট্রি থেকে পুরোপুরি মুছে গেল। আর TDR যে কোম্পানিটাকে কিনেছে অতো অল্প পয়সায় তাদের কর্মীদের দেশের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের মত ব্যবহার করতে লাগল যেন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, তাদের মাইনে বাড়ল না, প্রমোশন হল না, অসম্মান বাড়ল, কাজ বাড়লো আর অনিশ্চয়তা বাড়ল।অর্থাৎ পেটও ভরলো না, জাতও গেল।

দ্বিতীয় যে লোকটির কথা বলব আমি যখন জয়েন করি, তিনি তখন ছিলেন কাস্টমার সার্ভিসের জোনাল ম্যানেজার। তাঁর নাম শ্রীসমর দেব চৌধুরী। উনি ছাড়া আরো ছজনের অ্যাডমিন সাপোর্ট ছিলাম আমি। জয়েন করার বছর দেড়েকের মাথায় ওঁর কোনো একটা ফাইলের এগ্রিমেন্টের পেপার উনি খুঁজে পাননি, উনি

সেইসময়ের যিনি GM ছিলেন তাঁর কাছে গিয়ে আমার নামে কমপ্লেইন করে আসেন সন্ধ্যেবেলায় আমি অফিস থেকে বেরোনোর পরে। পরেরদিন আমি অফিসে যেতেই আমার ডিপার্টমেন্টের একজন সিনিয়র মহিলা আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন ওই এগ্রিমেন্ট পেপারের কথা, আমি তাঁকে 'দেখছি' বলে ফাইল ঘেঁটে অন্য একটা ফাইলে পেপারটা খুঁজে পাই যেটা সমরদা নিজেই লিখেছিলেন সেখানে রাখতে, পেপারের ওপরে সমরদার নিজের হাতে সেই ফাইলের কথা লেখা ছিল। আমি সেই সিনিয়র মহিলাকে সে কথা জানাতে তিনি আমাকে ফাইলটা নিয়ে GM এর কাছে যেতে বলেন। আমি গেলে সেই সিনিয়র মহিলা GM কে দেখান সেটা, তারপরে সমরদার ডাক পড়ে ওখানে, আমি চলে আসি। সমরদাকে সেই সিনিয়র মহিলা এবং GM কিছু বলেন যেটা ওঁর খারাপ লাগে। এই ঘটনার পর থেকে সমরদা সুযোগ খুঁজতে থাকেন তাঁর ওই অপমানের প্রতিশোধ নেবার, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উনি নিজে ঠিকঠাক ব্যবসা না আসার কারণে শাস্তিমূলক ট্রান্সফার হন অন্য জায়গায় যে ইউনিটটা তখন লসে চলছে। সেই ইউনিটটাতে নতুন কিছু ছেলে জয়েন করে এবং মূলতঃ তাদের চেষ্টায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই ইউনিট প্রফিট করতে শুরু করে। এবার পাকে চক্রে আস্তে আস্তে এই ইউনিটটা সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে ভীষণ ভালো ব্যবসা করতে শুরু করে আর সমরদা তার হেড হয়ে বসেন। আস্তে আস্তে সমরদা তাঁর পছন্দের কিছু খারাপ সুবিধেবাদী লোকজনকে সেখানে নিয়ে যান অন্য ইউনিট থেকে এবং তাঁদের মধ্যে একজনকে সবার মাথায় বসান শুধুমাত্র সে তাঁর এক গেলাসের বন্ধু বলে। সমরদা নিজে রিজিওনাল ডেলিভারি হেড হয়ে বসেন। এমন সময় আমি ট্রান্সফার হই HR ডিপার্টমেন্টে। সমরদা এতদিনে আমাকে হাতের মুঠোয় পান এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এমন পরিস্থিতি তৈরী করেন যাতে আমি চাকরি ছাড়তে বাধ্য হই। সমরদার সমসাময়িক একজন আমার পাশের টেবিলে বসতেন যিনি আমাদের স্কুলে টিচার শ্রীমতী বিনতা ধর গুপ্তের ছেলে, তাঁর নাম শ্রীকল্লোল ধরগুপ্ত। কল্লোলদার সঙ্গে কোনো একসময় সমরদার একটু ঝামেলা হয়েছিল। সেই ভদ্রলোককেও উনি বাধ্য করে ছিলেন চাকরি ছাড়তে যখন তাঁর আর মাত্র দু বছর বাকি আছে রিটায়ারমেন্টের। সমরদা ডেলিভারি হেড থাকার সময় যারা যারা চাকরি ছেড়েছেন, সবার সঙ্গেই সমীরদার কখনো না কখনো কিছু সমস্যা হয়েছিল। সমরদা চরিত্রটাই ভীষণ রিভেঞ্জফুল। কিন্তু অলক্ষ্যে বসে ঈশ্বর হেসেছিলেন সেদিন। আমি চাকরি ছাড়ার দুবছর পরে সমরদা রিটায়ার করেন। ওঁর খুব আশা ছিল ডাটা কোম্পানি ওঁকে এক্সটেনশন দিয়ে আরো কয়েক বছর রাখবে, সেটা হল না, আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার উনি রিটায়ার করার পরেও এসে ম্যানেজমেন্টের মিটিংএ বা কোনো ডিসিশনে মতামত দিতে গেছিলেন, ওঁকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয় ওঁর মতামতের কোনো দাম আর নেই, উনি যেন যেচে পাত্তা নেওয়ার চেষ্টা না করেন।

দুহাজার চারে আমার মা চলে গেলেন বিনা নোটিসে হঠাৎই, দু হাজার পাঁচের শেষের দিকে যখন বড়ো একটা প্রজেক্ট শুরু হল ই-গভর্ণেন্সের আমাকে রাতারাতি বদলি করা হল নিজাম প্যালেসের কাস্টমারের অফিসে। কিন্তু আমার খুব কিছু অসুবিধে হল না, আমাকে ওখানকার সিঙ্গল পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট করে আমার সুপারভিসনে তিনশো ছেলে মেয়ে কাজ করতে লাগল এবং ওই প্রজেক্ট গোল্ড প্রজেক্ট হিসেবে পুরস্কৃত হল। প্রজেক্ট ম্যানেজার পুরস্কৃত হলেন মোটা টাকায়, তারপর এখানকার চাকরি ছেড়ে অন্যত্র ঢুকলেন। যাদের জন্য প্রজেক্ট সফল হল, তারা কেউ কিছুই পেল না। দুহাজার সাতে ফেরত এলাম হেড অফিসে কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে নয়, কাস্টমার সার্ভিসে। সেখানে বছর চারেক রেখে বদলি হলাম হিউম্যান রিসোর্সে। বদলি করেই একমাসের ট্রেনিং এ পাঠাল দিল্লী। সেখানে কর্পোরেট ম্যানেজার রীতিমতো হুমকি দিতে লাগলেন যেন দিনরাত অফিসেই থাকি। এদিকে

মেয়েটা বড্ডো একা মনে করে নিজেকে, ওর পড়াশোনা আমিই দেখি, সেটারও ক্ষতি হচ্ছে। তখন এমন হল যে শনিবার রবিবারও হয় কন-কল থাকে, বা মিটিং থাকে অফিসে, “না” বললেই নানান অপ্রিয় কথা উঠতে থাকে, এদিকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত অফিসে থাকতে হবে অন্য দিনগুলোতে। অসুস্থ হলে সেটা ভীষণ খারাপ একটা ব্যাপার বলে মনে করে অফিসের লোকজন। দুহাজার দশের শেষের দিক থেকে আমি বাড়িতে বলছিলাম আর পারছিনা, এবার ছেড়ে দেব, কিন্তু ছাড়তে পারছিলাম না বোনের বিয়ের জন্য অনেক টাকা লোন নিয়েছিলাম ব্যাংক থেকে, সেটা বাকি ছিল।

দুহাজার এগারোর প্রথম থেকেই খিটির মিটির চলছিল আমার সাথে, মার্চ মাসে সেটা চরমে ওঠে, একত্রিশে মার্চ আমি রিসাইন করলাম। যেদিন চাকরি ছেড়ে বাড়ি এসেছিলাম, সেদিন এবং তারপরের ছমাস খুব খারাপ লাগত কিন্তু মেয়ের জন্যে আস্তে আস্তে সেই খারাপ লাগাটা কাটিয়ে উঠলাম। অন্য বেশ কয়েকটা জায়গায় তারপরে অফার এসেছে, সত্যি কথা বলতে কি এখনো বেশ কিছু জায়গায় আমি চাইলেই যেতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে অন্তত এই পাঁচ ছটা বছর ওকে পুরোপুরি দেওয়া উচিৎ। এখন ও কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে, পার্ট টু পর্যন্ত ওর পাস সাবজেক্ট আমি দেখেছি। এখনো দরকার হলে ওর পড়া ধরতে হয়, ওর আমাকে এখনো লাগছে। এরপরে এম এ তে ঢুকবে ও।

মানুষ যখন ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরা ফেরা করে তখন তার মনে হয় যে সে হাতে রেখে সকলের মাথা কাটতে পারে ইচ্ছে করলেই, কিন্তু ভুলে যায় যে ওপরওয়ালা অলক্ষ্যে বসে সবই দেখছেন। ওপরওয়ালার লাঠি যখন পড়ে তখন তাতে শব্দ হয় না বটে, কিন্তু তার অভিঘাত সামলানোর ক্ষমতা কারুর নেই। নিজের কর্তৃত্ব অভিমানে অন্ধ হয়ে মানুষ যে অপকর্ম করে তার হিসেবে তাকে এই কর্মভূমিতেই মিটিয়ে যেতে হয়। এগুলো অনেক আগের ঘটনা কিন্তু এর ফলশ্রুতি আজও আমার মত কেউ কেউ বয়ে চলেছি। আমার মত সোহিনীরা সৎ হয়ে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে এইভাবে দাম দেয় নিজেদের জীবনের অমূল্য সময় আর নিষ্ঠা নষ্ট করে কিছু সুযোগসন্ধানী লোকের বিষাক্ত অভিপ্রায়ে। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের বাহ্যিক চাকচিক্য থাকলেও ওই ইঁদুর দৌড়ে অনেক মানুষ নিজেদের মানাতে অক্ষম হন শুধু মাত্র ওপরের মানুষগুলো ভালো নয় বলে এবং চাকরি ছেড়ে দেন।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ হয়তো অনেক কম এখন, কিন্তু মানসিক স্বস্তি আছে, বাড়িতে শান্তি আছে কারণ আমি আমার মর্জির মালিক। এর মধ্যে উঁচু ক্লাসের ছেলে মেয়ে পড়িয়েছি, চেষ্টা করেছি আমার যেটুকু জ্ঞান সেটুকু দিয়ে সঠিকভাবে তাদের এগিয়ে দিতে, অনেকটা সফলতাও পেয়েছি। এখন ভাবতে বসলে মনে হয় মোট একুশ বছরের চাকরি জীবনে মানসিক যন্ত্রনা ভীষণ পেয়েছি, মানসিক শান্তি পাইনি। একটা সময় পরিবারের পাশের দাঁড়ানোর জন্যে, নিজের স্বনির্ভর হওয়ার জন্যে চাকরি করেছিলাম, এখন সেই চাপটা নেই, বাবা মা দুজনেই পরলোকে, বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, সে নিজে স্বনির্ভর, আমার নিজের প্রয়োজন খুব সামান্য, তাই তার জন্য আর এই টানাপোড়েনের মধ্যে ঢুকব না, দেখিই না চলে কিনা।আজ পঁচিশ বছর পরে যখন এখানে লিখছি, দেখছি সব যেন চোখের সামনে ভাসছে।

॥ইষ্টশক্তি॥

গঙ্গোত্রী দর্শন করে নিচের দিকে নামছে সুরজ। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে পাকদন্ডী রাস্তায় নামতে নামতে দুবার সে পথ হারিয়েছে, দুবারই তাকে কোনো না কোনো গ্রামবাসী ঠিক রাস্তায় এনে দিয়ে গেছে। শিবক্ষেত্র দেবভূমির এই পথে ঘন্টা তিনেক হেঁটে এসে পৌঁছল হিমালয়ের কোলে উত্তরাঞ্চলে রনকপুর নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে। গ্রামে কয়েকঘর লোকের বাস, এতোটা ওপরে আর ভীষণ ঠান্ডা বলেই হয়তো লোকবসতি কম এখানে। গ্রামের মাঝখানে আছে একটা শিবমন্দির আর একটা রাধাকৃষ্ণের মন্দির। গ্রামের একধার দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গার ক্ষীণ ধারা, চঞ্চল বালিকার মতো পাথরের খাঁজ দিয়ে সে ছুটে চলেছে সমতলের দিকে। গঙ্গামায়ের এই রূপ দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে এই জলধারা আমাদের সভ্যতাকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। গঙ্গার ওই জলের ধারা ধরে এসেই সুরজ পৌঁছল এই রনকপুর গ্রামে প্রায় সায়াহ্নে।

দ্রুত দিন শেষ হয়ে আসছে, ঠান্ডাও বাড়ছে ।সুরজকে সন্ধে নামার আগে নিজের রাতের আশ্রয়টুকু জোগাড় করে নিতে হবে। সুরজ পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালো শিবমন্দিরের দালানে। মন্দির এখন খুলেছে কিন্তু পূজারীজী নেই সেখানে। একটু পরে সন্ধ্যারতির ঠিক সময় পূজারীজী এলেন, সুরজকে দেখে বুঝলেন যে সে পরিব্রাজক। তার অযত্নে লালিত অজস্র দাঁড়িগোফের জঙ্গলে ঢাকা কচি মুখখানি দেখে বোধহয় মায়া হল পূজারীজী ভীমশঙ্করজীর। তিনি মন্দির সংলগ্ন ঘরে সুরজের থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে সাতটায় চলে গেলেন নিজের বাড়িতে। রাত্রে এই অঞ্চলে খুব ঠান্ডা পড়ে আর ভালুক বেরোয়। তাই সুরজকে ভালো করে দোর দিয়ে শুতে বলে তিনি চলে গেলেন।

নিস্তব্ধ রাত্রে নদী সংলগ্ন গ্রামেতে হরেক আওয়াজ প্রথমে কর্ণগোচর হচ্ছিল। ধীরে ধীরে সেই আওয়াজগুলো কমে এলো। সেদিন পূর্ণিমা। চরাচর যেন গলিত রূপো দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন প্রকৃতিদেবী, দূরে রজতশুভ্র গিরিশৃঙ্গ যেন শীতল জ্যোৎস্নায় আস্নানে রত। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সন্ধ্যারতীর ঘন্টাধ্বনিও থেমে গেছে। দূর থেকে রাতচরা পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে অবিরাম জলধারার কুলুকুলু রব। শুয়ে শুয়ে সুরজ ভাবছে নিজের ফেলে আসা দিনের কথা।

গাড়োয়ালের এক সম্পন্ন চাষী পরিবারের ছেলে সে, কিন্তু বড়োই অভাগা। জন্মানোর আগেই হিল ডাইরিয়াতে বাবা চলে গেছিলেন আর সুরজের যখন পাঁচ বছর বয়স হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে মা চোখ বুজলেন। এতবড় পৃথিবীতে একদম একা হয়ে গেল সে, আশে পাশে জ্ঞাতিরা কয়েকদিন “আহা উহু” করল কিছুদিন, কিন্তু কেউ দায়িত্ব নিল না। গ্রামের ধারে এক সন্ন্যাসীর ডেরা ছিল যেখানে মা শিশু সুরজকে নিয়ে প্রায়ই যেতেন, সন্ন্যাসী নানান সৎ কথা আলোচনা করতেন, মা কিছু বুঝতেন কিনা জানে না সুরজ, কিন্তু গিয়ে বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী রামায়ণ পাঠ করতেন, মা সুরজকে নিয়ে বসে সেগুলো শুনতেন। সুরজেরও ভারী ভালো লাগত ওই রামায়ণের কাহিনী শুনতে।

মা চলে যেতে কয়েকদিন অনাহারে থেকে একদিন ছোট্ট সুরজ পায়ে পায়ে গিয়ে উপস্থিত হল সেই সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী শিশু দেখে নারায়ণ জ্ঞানে এক সপ্তাহ ওকে রোজ খাওয়ালেন। তারপরে একদিন ওর সঙ্গে এসে ওর জ্ঞাতি কাকাদের সাথে কথা বলে বাড়িঘরের ভার তাদের হাতে দিয়ে শিশু সুরজকে নিয়ে গ্রাম ছাড়লেন। সন্তানস্নেহে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে উপস্থিত হলেন উত্তর প্রদেশের রাজাপুরে, তুলসীদাসজীর জন্মস্থানে। সেখানে কিছুদিন থেকে ওকে দীক্ষা দিলেন এবং কিছু কিছু লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। প্রায় সাত বছর সেখানে থেকে সেখান থেকে এলেন চিত্রকুটে। এই সন্ন্যাসী নিজে ছিলেন রামায়েৎ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, তাই রামই ছিল তাঁর উপাস্য, ওকেও উনি রাম মন্ত্রেই দীক্ষা দিয়েছিলেন আর শিখিয়ে ছিলেন যেকোনো অবস্থায় রামের শরণ নিতে।

তারপরে ওর আঠারো বছর বয়স হলে ওকে পাঠিয়েছেন সারা ভারত পরিব্রাজন করে ইষ্টের মাহাত্ম্য বুঝতে। একরকম একবস্ত্রে আজ পাঁচ বছর সে পরিব্রাজনা করছে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পড়েছে, কিন্তু বেরিয়েও এসেছে, রামনামের মাহাত্ম্য তো সে বুঝেইছে, সঙ্গে সঙ্গে এটাও উপলব্ধি হয়েছে সুরজের যে তার গুরু ওই সন্ন্যাসী রামশরণজী নিজেও একজন সিদ্ধ মহাত্মা যিনি শক্তি রূপে সর্বদা রয়েছেন শিষ্যের সঙ্গে। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সুরজের কখন চোখটা ঘুমে জড়িয়ে এসেছে ও নিজেও জানে না।

হঠাৎ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে প্রায় শেষ রাতের দিকে ওর ঘুম ভেঙে গেল। যদিও পূজারী ভীমশঙ্করজী ওকে রাত্রে বেরোতে বারণ করেছিল এক্ষেত্রে ওকে তো যেতেই হবে, ও উঠে মন্দির সংলগ্ন ঘরের দরজা আলতো করে খুলে বাইরে এলো, দরজাটা ভেজিয়ে ও এগোলো সামনের নদীর ধারের দিকে, সেখানে প্রাকৃতিক কর্মটি সেরে ফেরার সময় হঠাৎ দেখল ওর সামনে একটা সচল কালো পাহাড় দৌড়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে ওর প্রাণ উড়ে যাবার জোগাড় তখন, অথচ পালানোর কোনো উপায় নেই। ওর বোধ বুদ্ধি কিচ্ছু কাজ করছে না তখন, কিভাবে যেন মনে পড়ল গুরুবাক্য ইষ্টমন্ত্র জপ করার কথা, সুরজ সেটাই করতে লাগল আর চোখের সামনে দেখতে লাগল একটু একটু করে মৃত্যুর ওর দিকে এগোনো। ওর পা দুটো যেন কেউ গেঁথে দিয়েছে মাটির সঙ্গে।

ঠিক হাত পাঁচেক যখন দূরত্ব ওর সঙ্গে ভালুকটার, হঠাৎ কোথা থেকে একটা বিশালদেহী হনুমানের উদয় হল আর সুরজ কিছু বোঝার আগে ওর হাল্কা শরীরটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে দৌড়ে এসে ওকে মন্দিরের ঘরের দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল।

এদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় সুরজ বিহ্বল হয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে ছিল মন্দিরের সেই ঘরটার সামনে, সেই ভালুকটাকে মন্দিরের দিকে আসতে দেখে ওর হুঁশ হল, ও তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে নিমেষে ঘরের দরজা আটকে দিল। শিকার ফস্কে যাবার রাগে সেই ভালুক এসে বেশ কয়েকবার দরজাটা আঁচড়ালো, শেষ ভীষণ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেল একসময়।

সুরজ একটু ধাতস্ত হয়ে ভাবতে বসল ইষ্ট আর গুরুর অপার কৃপার কথা, এই সব ভাবতে ভাবতে আর একদম মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার কথা ভেবে বাকী রাতটা আর ঘুম এলো না সুরজের চোখে।

বেলা সাতটায় পূজারীজী আসলে সে বাইরে এসে নদীতে স্নান সেরে গঙ্গাজল দিয়ে মহাদেবের পুজো করতে বসে কেঁদে ফেলল। পূজারীজী তাই দেখে ওকে জিজ্ঞেস করলেন কী ব্যাপার, সুরজ আগের রাতের ঘটনা আনুপূর্বিক ওঁকে বলতে উনি বললেন যে এখানে বাঁদরের উৎপাত আছে বটে কিন্তু এতো বড়ো হনুমান যে মানুষকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে তেমন তো আছে বলে জানেন না।

প্রথম পর্বের শেষ ভাগ
****

তারপরে মন্দিরে আগত গ্রামবাসীদেরও জিজ্ঞেস করলেন যে তারা কেউ এতো বড়ো হনুমান দেখেছে কিনা, তারাও একই কথা বলল যে এতো বড়ো হনুমান এই গ্রামে নেই। তখন ভীমশঙ্করজী বললেন সুরজকে , "তুম তো সাচ্চে দিল সে পরিব্রাজন কর রহে হো, ইসিলিয়ে স্বয়ং রুদ্রাবতার হনুমানজী আয়ে থে তুমহে রক্ষা করনে।" কৃতজ্ঞতা আর অনুপম উপলব্ধিতে সুরজ কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলল সামনের রাস্তা ধরে ওর পরবর্তী গন্তব্যে।

দ্বিতীয় পর্ব
******

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা রাস্তা চলে এসেছে বুঝতে পারছে সুরজ। গঙ্গার তীর ধরে নামছে সে, কিছু কিছু জায়গায় তাকে খাড়া পাহাড় পেরোতে হলেও সে এইভাবে নামতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করছে, কারণ এতে সহজে পথভ্রষ্ট হবার ভয় কম। রাস্তায় আসতে আসতে সে পেরিয়েছে বিভিন্ন ডালের ক্ষেত, কোথাও অড়হর ডালের ক্ষেত, কোথাও মুসুর ডালের ক্ষেত, কোথাও ছোলা বা চানার ক্ষেত, কোথাও আবার বিস্তীর্ণ আনাজের ক্ষেত, হয়ে রয়েছে ক্ষেতের মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, কড়াইশুঁটি মত নানাবিধ সব্জি। উত্তরাঞ্চলের এইদিকটার জনপদগুলির বাসিন্দারা মূলতঃ নিরামিষাশী গোবলয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাদের সব্জি আর ডালটাই মুখ্য খাবারের মধ্যে পড়ে। আর প্রায় প্রতি বাড়িতে এরা গোপালন করে, কোথাও কোথাও ছাগলও রাখে দুধের জোগানের জন্য। নিতান্তই গরীব এখানকার অধিবাসীরা কিন্তু অদ্ভুত অতিথিবৎসল, এদের কাছে অতিথি মানেই নারায়ণ আর সেই নারায়ণের সেবা এদের ধর্ম। নিজেরা না খেয়েও আতিথেয়তায় কোনো ত্রুটি রাখে না এরা।

আজকে চলেছে সুরজ রাস্তা ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। বিরাট বিরাট বহু প্রাচীন মহিরুহের সাথে লতানে লতাগাছের সমাহার এই অরণ্যতে। প্রচুর চেনা অচেনা পাখির কলকাকলিতে মুখরিত অরণ্যভূমি, গাছে গাছে ঝুলছে পাখির বাসা, বেশ কিছু বাবুই পাখির বাসা চোখে পড়ল ওর। প্রায় প্রতিগাছের ওপরে অজস্র পাখিদের বাসা আর তাতে রয়েছে তাদের ছানাগুলো, তাই আশেপাশেই হয় মা পাখি নয় বাবা পাখিগুলো রয়েছে। বনবেড়াল, খরগোশ, কাঠবেড়ালি ঘুরে বেড়াচ্ছে বনের ভেতরে। লোকমুখে শুনে এসেছে ভালুক আর চিতার আনাগোনা আছে এদিকটাতে। তাই সাবধানে চলতে হচ্ছে। বেশ কিছু গাছে ঝুলছে মৌমাছির চাক, অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও যে ঐ গাছগুলোর কাছে যাওয়া বিপজ্জনক, কারণ মৌমাছির ঝাঁক এসে হুল ফুটিয়ে দিলে সেটা খুবই পীড়াদায়ক।

হাতের লাঠি আর ঝোলা নিয়ে দেখেশুনে এগোতে হচ্ছে, প্রচুর কাঁটাগাছের বন হয়ে আছে, একটা জায়গায় একটুতাড়াতাড়ি হবে মনে করে ও কাঁটাগাছের সেই বনের মধ্যে ঢুকল, এবারের যত এগোচ্ছে চারিদিক থেকে কাঁটাঝোপ যেন ঘিরে ধরতে লাগল ওকে। যে রাস্তা দিয়ে ঢুকেছিল সেই রাস্তাটাও আর খুঁজে পাচ্ছে না, জামাকাপড়, ঝুলি সব কাঁটার আঘাতে কণ্টকিত হয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার। সুরজ সমানে "জয় শ্রীরাম" বলে ধ্বনি দিতে লাগল যদি কোনো গ্রামবাসী বা পথচারীর কানে ওর ডাক পৌঁছয়, কিন্তু কোনো জবাব পেল না, কেঁদে ফেলল সুরজ। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ চোখে পড়ল ওপরে পাহাড়ের খাঁজ ঘেঁষে একটা পাকদন্ডী রাস্তা যেটাও কাঁটাগাছে ভরা কিন্তু হাঁটা যাবে। প্রায় বুকে হেঁটে সুরজ উঠে এলো সেই পাকদন্ডী রাস্তাটাতে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পরে দেখতে পেল রাস্তা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হচ্ছে সামনে, ও এগোতে লাগল। আরো বেশ কিছুটা পথ আসার পরে চাষের ক্ষেত দেখতে পেল, এক কৃষককে জিজ্ঞেস করে জানলো সামনেই পীচের রাস্তা আছে। আস্তে আস্তে ঐ পীচের রাস্তায় যখন উঠল ও তখন আর বেশী বেলা বাকী নেই। দ্রুত পা চালিয়ে সুনারি গ্রামে পৌঁছল সুরজ। তখন আর ওর দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই।

এসে কোনোরকমে দেহটাকে সমর্পণ করল সামনের শিবমন্দিরের দালানে এবং ক্ষুধিত আর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। গোটা শিবমন্দির চত্বর জুড়ে বেশ কিছু বাঁদর বসে আছে। ও আর সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থায় ছিল না তখন। সুনারি গ্রামের ধারে একদম শেষ প্রান্তে এই মন্দির, খুবই কম জনবসতি এখানে। কতক্ষন ঘুমিয়েছে ও জানে না, একসময় দেখল কেউ একটা ওকে নাড়াচ্ছে প্রবল ভাবে। ও উঠে বসে অবাক হয়ে দেখল একটা মুখপোড়া হনুমান ওকে ডাকছে, ও উঠে বসতে ওর সামনে রাখা কিছু পাকাফল ওকে দেখিয়ে সে চলে গেল। সুরজ লক্ষ্য করে দেখল ওর কয়েক হাতের মধ্যে বেশ কয়েকটা বাঁদর আর হনুমান বসে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু ওর সামনের ঐ ফলগুলোতে কেউ হাত দিচ্ছে না। সবে অন্ধকার নামছে চরাচরে, একটা দুটো প্রদীপ জ্বলে উঠছে দূরের কুটিরের ভেতরে, সন্ধ্যার শঙ্খ ধ্বনি আর ধূপের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। সুরজ ফল কটা হাতে নিয়ে ঝোলা আর লাঠিটা মন্দিরের দালানে রেখে অনতিদূরে প্রবাহিত গঙ্গার পুণ্য শীতল ধারায় আগে নিজে অবগাহন করে তারপরে ফল কটা ধুয়ে নিয়ে মন্দিরের দালানে ফেরত এসে দেখল মন্দিরের পূজারীজী এসে গেছেন সন্ধ্যারতি করতে। পূজারীজী সন্ধ্যারতি সমাপান্তে ওকে পুজোর দুধ, খোয়া, আটার হালুয়া প্রসাদ দিয়ে মন্দিরের ভেতরে ওর শোবার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। সুরজ সেই ফলের সঙ্গে এই প্রসাদ নিয়ে খেতে বসছে যখন সেই হনুমানটা এসে ওর সামনে বসল, সুরজ সব খাবারটা দু ভাগে ভাগ করে একটা ভাগ ঐ হনুমানটাকে দিলে পরে সে তার ভাগ থেকে ফলগুলো সুরজের ভাগে তুলে দিয়ে শুধু প্রসাদটা গ্রহন করল ।সুরজ খুব অবাক হল। খেয়ে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল সুরজ।

পরেরদিন বেরিয়ে এগোনোর সময় বেশ কিছুদূর ওর সঙ্গে সঙ্গে এলো সেই হনুমানটা, তারপরে ফিরে গেল, যেন

এগিয়ে দিতে এসেছিল। আবার জঙ্গলের রাস্তায় চলতে চলতে সুরজ এসে উপস্থিত হল রুদ্রপ্রয়াগের আগের একটা গ্রামে। বেলা তখন আড়াইটে। অড়হর ক্ষেতের পাশ দিয়ে রাস্তা, একটু এগোতেই ক্ষেতে কর্মরত কৃষকটি এসে হাত জোড় করে ওকে অনুরোধ করল ঐ কৃষকটির গ্রামের রাম মন্দিরে সেই রাতে অতিথি হতে। সুরজকে রীতিমতো অনুনয় বিনয় করে নিয়ে গেল গ্রামের ভেতরে। সেই মন্দিরের একটু দূরেই ঐ কৃষক সুখনরামের বাড়ি। সুরজকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা, পুরী, কড়াইশুঁটির সব্জি আর খোয়া খাওয়ালো, এরা বলে সেবা দেওয়া। খেতে খেতে সুরজ সুখনরামের পরিবারের লোকের মুখে জানতে পারল যে সুখেনরামের গত তিনদিন ধরে প্রবল জ্বর যাতে সে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে, আশে পাশে ডাক্তার না থাকায় তারা তেমন ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারেনি। সুরজের কাছে তার ঝোলার মধ্যে কিছু জড়িবুটির ওষুধ মজুত থাকে সবসময় আপদে বিপদে লাগবে বলে। সুরজ তখুনি কিছুটা ওষুধ সুখনরামকে সামনে বসে খাওয়ালো, বাকিটা সুখনরামের মেয়ের হাতে দিয়ে সেই রাম মন্দিরে এসে আশ্রয় নিল। নিজের ইষ্ট মূর্তির সামনে বসে সারারাত তার স্মরণ, মনন করল। একসময় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র যেন তাকে বলছেন যে ওকে এই গ্রামে উনি নিয়েই এসেছেন সুখনরামের অসুখ সারাতে আর তিনি ওর ঝোলাতে আরো তিনগুণ জড়িবুটি রেখে দিয়েছেন যেগুলো পরেরদিন যেন সুরজ সুখনরামকে দিয়ে দেয়, সুখনরাম আর দুদিনেই ভালো হয়ে যাবে। পরেরদিন সকালে উঠে সুরজ দেখল সত্যিই তার ঝোলাতে প্রচুর জড়িবুটি ভরে গেছে। বিদায় নেবার আগে সুখনরামের বাড়ি গিয়ে সেগুলো সুখনরামকে দিতে গিয়ে শুনল আগের রাত্রি থেকেই আর সুখনরামের জ্বর আসেনি।

ওষধিগুলো সুখনরামের হাতে দিয়ে এগোতে এগোতে ভাবতে লাগল সুরজ যে সুখনরামের অসুখকে কেন্দ্র করে শ্রীরামচন্দ্র কী অদ্ভুত লীলাই করলেন আর বার বার মাথায় ঠেকালো তার ঝোলাকে কারণ এই ঝোলা প্রভু রামের স্পর্শে ধন্য হয়ে গেছে!!! সুরজের মনে পড়ল তার গুরু রামশরণজীর মতে ইষ্ট দর্শন সর্বাবস্থায় সত্য, সে স্বপ্নে হোক আর জাগরণেই হোক। তার ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্র তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন, এতো বড়ো সৌভাগ্যের ব্যাপারটা যখনই সে ভাবছে তখনি তার চোখের জল বাঁধা মানছে না, এখুনি তার মনে হচ্ছে ছুটে একবার চিত্রকুটে গিয়ে গুরুর চরণবন্দনা করে আসতে। রামশরণজী শুধু তার গুরু নন, তিনি পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা সব, তাই তাঁর দর্শনের জন্য মন সুরজের অকুল হয়ে আছে। সে ঠিক করল এই চারধাম পরিব্রাজনা শেষ করে সে একবার চিত্রকুটে গিয়ে কিছুদিন থেকে গুরুর দর্শন আর সেবা করে আবার বেরোবে পরিব্রাজনায়।

॥পয়মন্ত॥

সকালে ঘুম থেকে উঠে সুমিতাদেবীর মনে পড়ল আর মাত্র এক মাস বাকী ছেলে অর্কর বিয়ের। এদিকে একা মানুষ সুমিতাদেবীর অনেক জোগাড়ই বাকী এখনো। ছেলে অর্ক মেরিনে আছে, সুমিতা দেবীর এক ছেলে এক মেয়ের মধ্যে অর্ক ছোট। সুমিতাদেবীর মনে পড়ছে নিজের বিয়ের সময়টা। জমিদার বাড়ির অতি আদরের মেয়ে সুমিতা দেবীর বিয়ে হয়েছিল ব্রিটিশ আমলের পুলিশের বেশ প্রভাবশালী দারোগা মনোতোষের সঙ্গে। বাপের বাড়ি থেকে সোনাতে আর দানসামগ্রীতে মুড়ে দিয়েছিল সুমিতাদেবীকে। বিয়ের পরে এসে উঠেছিলেন শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। দুই বড়ো ভাসুর আর তাঁদের ছেলেমেয়েদের দিয়ে বিশাল যৌথ পরিবার।

ভালোই দিন কাটছিল সুমিতাদেবীর মনোতোষর সঙ্গে। একে একে দুই ছেলে মেয়ে হল, মেয়ের বয়স যখন ছয় আর ছেলের দুই , ঠিক সেই সময় হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলেন মনোতোষ। পুলিশের বাড়ি, খোঁজ খবরের খুব ধুম পড়ে গেল, কিন্তু কিছু লাভ হল না, কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না মনোতোষের। এদিকে দেখতে দেখতে একটা বছর কাটতেই সুমিতা দেবীর স্থান হল ছেলেমেয়েসহ বাড়ির আশ্রিতদের সাথে। বাড়ির ছোটবৌ থেকে রাতারাতি তিনি হয়ে গেলেন বাড়ির রাঁধুনি আর কাজের লোক। কিন্তু তিনি সহ্য করে চললেন।

তার পাঁচ বছরের মাথায় একদিন তাঁর ডাক পড়ল বড়ো ভাসুরের ঘরে। গিয়ে দেখলেন যে তাঁর নামে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে দশ হাজার টাকার ড্রাফট এসেছে । সেটা তিরিশের দশক, দশ হাজার টাকা মানে অঅঅঅনেএএএএএক টাকা তখন, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে সুখ লেখা নেই। বড়ো ভাসুর যিনি তখন বৃটিশ পুলিশের আই জি ছিলেন পরিষ্কার বলে দিলেন যে সুমিতাদেবী যদি ওই টাকা নেন তবে তাঁকে ওই বাড়ি ছাড়তে হবে ছেলে মেয়ের হাত ধরে। একলা অনাথা মেয়েমানুষ সেই দুঃসাহস আর দেখাতে পারেন নি। সেই টাকা ফেরত গেল, কারণ টাকা নিলে তাঁকে দিয়ে আর বিনা মাইনের ঝিয়ের কাজটা করানো যেত না। মনোতোষের কোনো খবর নেই।

মেয়ের বছর ষোলো বয়েসে জ্যাঠারা বিয়ে দিল উত্তর কোলকাতার এক পড়তি বড়োলোক বাড়িতে যাদের বাকসর্বস্বতা ছাড়া আর তেমন বলার মত কিছু নেই। মেয়ে বরাবরই একটু জ্যাঠা জেঠিমার ধামাধরা, তাই তার অপরিণত বুদ্ধিতে সে বুঝতে পারল না প্রথমে কেমন বিয়ে হয়েছে, পরে বুঝল কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে

গেছে। তবু মেয়ে সেখানে স্থিতু হল। ছেলে অর্ক আই এ পাশ করে ঢুকল মেরিনে আশি টাকা মাইনের অ্যাপরেন্টিস হিসেবে, তারপরে কঠোর পরিশ্রম করে, মেরিনে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে আজকে সে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার ফরেন শিপে। বিয়ে হচ্ছে তার পূর্ব রেলের চিফ একাউন্টস অফিসারের মেয়ে যে আবার সম্পর্কে বড়ো ভাসুরের স্ত্রীর বোনঝি অঞ্জলি তার সাথে, মেয়েটি সুশ্রী, ইন্টারমিডিয়েট পাশ, নম্র ভদ্র। বিয়ের ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেরদিন খবর এলো অর্কর আরেকটা প্রমোশন হয়েছে। মনে মনে সুমিতাদেবী ভাবলেন, মেয়েটা পয়মন্ত তো বেশ!!! আহা তাই যেন করেন ভগবান, সব কিছু যেন এই মেয়ের আয়ে পয়ে স্বচ্ছল সুন্দর হয়!!! ছেলে অর্ক এর মধ্যে নিজের বাড়ি করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে, কারণ সে বোঝে মায়ের দুর্দশাটা।

সুমিতাদেবী তাড়াতাড়ি গেলেন বড়ো জায়ের কাছে, বড়ো জা জানালেন সেদিনই বড়ো ভাসুর যাচ্ছেন কনেকে আশীর্বাদ করতে। বড়ো জায়ের বাপের বাড়ি বলে তিনিও গেলেন। একজোড়া মকরমুখী বালা দিয়ে কনের আশীর্বাদ করে এসে ওঁরা খুব প্রশংসা করলেন কনের ব্যবহারের। কিন্তু সুমিতাদেবী এক অজানা অনিশ্চয়তায় ভুগতে লাগলেন। এরপরে একদিন মেয়ের বাবা কাকারা এসে অর্ককে আশীর্বাদ করে গেল ঘড়ি, আংটি, বোতাম, সোনার গিনি দিয়ে।

BANGLADARPAN.COM

ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল বিয়ের দিন। অর্ককে বেশ কিছু আত্মীয় স্বজন নেমন্তন্ন করে আইবুড়োভাত খাওয়ালো। বিয়ের দুদিন আগে হল আনন্দ নাড়ু, সব এয়োরা মিলে সেই আনন্দনাড়ু গড়ে ভাজল, বিলোলো, আবার কিছুটা সরিয়ে রাখল তত্ত্বের জন্য। বিয়ের আগের দিন আড়ম্বর করে আইবুড়োভাত দিল বড়ো ভাসুর, জা বাড়িতে বেশ কিছু আত্মীয় স্বজন বলে। সেদিন থেকে ভিয়েন বসে গেল বাড়িতে মিষ্টি তৈরির জন্য। মাছের মাথার ডাল, পোলাও, ঝুরো আলুভাজা, বেগুনি, পার্শে মাছের ঝাল, তোপসে ফ্রাই, চিংড়ি মালাইকারি, দই কাতলা,পাঁঠার মাংস, চাটনি, দই, মিষ্টি দিয়ে বিরাট কাঁসার বগি থালায় সাজিয়ে সঙ্গে বড়ো বড়ো কাঁসার বাটিতে সব সাজিয়ে গুছিয়ে আইবুড়োভাত খাওয়ালেন অর্কর বড়ো জ্যাঠা আর জেঠিমা অর্ককে যদিও রান্নাটা করলেন সুমিতাদেবীই। পরেরদিন বিয়ে। ভোরে উঠে দধিমঙ্গল করে অর্ককে চিঁড়ে দই খাওয়ালেন সুমিতাদেবী। তারপরে সব জায়েদের নিয়ে, ভাসুরপো বৌদের নিয়ে গেলেন জল সইতে। তারপরে ছেলের গায়ে হলুদ দিয়ে সেই হলুদ গায়ে হলুদের তত্ত্বের সঙ্গে গেল কনের বাড়িতে। বিকেলে মাকে প্রণাম করে বরযাত্রীসহ অর্ক গেল বিয়ে করতে, বরকর্তা হয়ে গেলেন বড়ো ভাসুর।

নির্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন করে পরেরদিন বেলায় বৌ নিয়ে আসবে যখন অর্ক দেখা গেল গোটা বাড়ি সেদিন জলহীন। আসলে রিসার্ভারের আউটলেট কেউ খুলে রেখে দিয়েছিল বৌকে অলক্ষুনে প্রমাণ করতে। বেলা বারোটায় অর্ক আসবে বৌ নিয়ে, ব্যাপারটা জানা গেল বেলা নটায়। সুমিতাদেবী তাড়াতাড়ি পাড়ার তিন চারজন ভারীকে বেশী টাকা দিয়ে আশেপাশের কল থেকে জল আনিয়ে ভর্তি করলেন রিসার্ভার। সাড়ে দশটায়

কাজ সমাধা হতে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। বারোটায় বৌ এলে তাকে বরণ করে ঘরে তুললেন, চলল স্ত্রী আচারের পর্ব, কড়ি খেলা ইত্যাদি। আলাদা ডেকে অর্ককে জানালেন ঘটনা । অর্ক গম্ভীর হয়ে গেল, সেদিন ওদের কালরাত্রি, রাত্রে নতুন বৌ অঞ্জলীকে নিজের কাছে নিয়ে শুলেন এবং তাকে সহজ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

পরেরদিন বৌভাত, নতুন বৌকে বললেন পায়েসটুকু করতে, নিজে সঙ্গে রইলেন তার, এদিন বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর নিজের বৌভাতের দিনটা। বাকী রান্না হয়ে গেলে বৌ দুপুরে বাড়ির সবাইকে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। সন্ধেবেলায় বৌভাতের অনুষ্ঠানে প্রথমে ফুলের সাজের সঙ্গে এলো তত্ত্ব মেয়ের বাড়ি থেকে, সেটা দেখতে ভীড় জমালো আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশীরা। প্রচুর লোকজন আসছে, উপহার দিয়ে খেয়ে দেয়ে যাচ্ছে।

অর্ককে একদিনের জন্য তার বাবার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটা ছেড়ে দিয়েছে তার বড়ো জ্যাঠা, নাহলে এই ঘরে তার জ্যাঠার রাজত্ব। সেই ঘরে কনের বাড়ির থেকে দেওয়া খাট বিছানা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে ফুলশয্যার জন্য আর তার পাশের গেষ্ট রুমটাও পরিষ্কার করে খাট বিছানা ঝেড়ে ঝুড়ে রাখা হয়েছে, কেন সেটা সুমিতাদেবী জানেন না। সন্ধে থেকে আত্মীয় পরিজনের হাঁকডাকে, বহুবর্ণ প্রজাপতির মত বিভিন্ন লোকের সাজগোজ, সুখাদ্যের ঘ্রাণে জমে উঠল অনুষ্ঠান। প্রচুর উপহার পেয়েছে তাঁর ছেলের বৌ অঞ্জলি, তাছাড়া অনেক খাবার বাড়তি হয়েছে, সবাই খুব সুখ্যাতি করছে অঞ্জলির যে সে খুব পয়মন্ত বলে।

নিমন্ত্রিতরা চলে গেলে ছেলে অর্ককে ডেকে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে স্ত্রী আচারের সেই চিঁড়ে দই খাওয়ানো হল, সেটা করল অর্কর দিদি আর জ্যাঠতুতো দিদিরা মিলে। ওদের তাড়া দিয়ে বের করে সুমিতাদেবী নিজে অর্কর ঘরের দরজা বন্ধ করতে যাবেন এমন সময় অর্ক আর অঞ্জলি বেরিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করে নিয়ে চলল সেই পাশের ঘরে। তারপরে তাঁকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে তারা দাঁড় করালো যার সামনে তাঁকে যে তিনি এজীবনে আর দেখতে পাবেন আশাই করেননি। সেখানে বসে আছে তাঁর জন্য অপেক্ষায় মনোতোষ যে এতো বছর ভবঘুরের জীবন কাটিয়ে রোগগ্রস্ত। অর্ক তাঁকে খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছে কালীঘাটের দরিদ্রনারায়ণ সেবার পংতি থেকে। মনোতোষের সেই সময় একটা গাড়িতে ধাক্কা লেগে স্মৃতি লোপ পায়। তারপরে এক বছর আগে অর্ক তাঁকে খুঁজে পায়, তাঁর চিকিৎসা করে এখন তিনি অনেকটাই ভালো। মনোতোষ সুমিতার সামনে বসে পড়লেন আর তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সুমিতাদেবী, অর্ক, অঞ্জলি, অর্কর দিদি কারোর চোখ আর শুকনো রইল না। সুমিতাদেবী মনোতোষকে ফিরে পেয়ে প্রথমেই মনে হল সত্যি অঞ্জলি খুবই পয়মন্ত। আর অর্ক আর অঞ্জলিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “তোদেরকে বিয়ের সেরা উপহারটা কিন্তু আমারই হল।” মুখে হাসি আর চোখে জল নিয়ে অর্ককে অঞ্জলির সঙ্গে সুমিতাদেবী পাঠালেন

তাদের ফুলশয্যার জন্য আর নিজে এতো বছর পরে মনোতোষের সামনে বসে ঈশ্বরের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানালেন তাঁর দুঃস্বপ্নের দিন অবসান করার জন্য।

BANGLADARSHAN.COM

॥রসনার রসে॥

দেবিকা আর প্রতীকের কয়েকদিন ধরে কথা বন্ধ, সবই হচ্ছে ভাববাচ্যে, সহজে কেউ সন্ধিতে যাবে না। কারণ রবিবারের মাংস রান্না। একজনের কষা চাই মাখো মাখো করে আর একজনের স্টু। সেই নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে হতে এখন চার পাঁচদিন কথা নেই। মাংস খেয়ে হজম হয়ে গেছে কিন্তু কেউ কারুর কাছে যায় নি মান ভাঙাতে।

বাড়ি চলছে নিজের নিয়মে, সকালের চা থেকে শুরু করে রাত্রের মশারি সবেতেই সংসারের নিজস্ব ছন্দে কোনো হেরেফের হয়নি। দুজনেই লাঞ্চ আওয়ারে ভাবছে একটা ফোন করলে হত কিন্তু বরফ গলাতে কেউ এগোচ্ছে না। আজকে অফিসে এসে প্রতীক ওর প্রমোশনের চিঠিটা পেল, ওদিকে দেবিকা পেল বেস্ট পারফরমেনসের অ্যাওয়ার্ড। আর মন মানলো না দুজনেরই।

অফিস ফেরতা প্রতীক একটা ফুলের বোকে আর ডিনারের জন্য দু প্লেট মটন কষা নিল আর দেবিকা একটা বডি ডিও আর এক প্যাকেট ফেরারো রচার চকলেট নিল প্রতীকের প্রিয়। বাড়িতে এসে দেবিকা আগে ঢুকে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে চা বানাতে শুরু করল “হামহে তুমসে প্যার কিতনা এ হাম নেহি জানতে” এমন সময় প্রতীক ঢুকল। সমস্ত অভিমান জল হয়ে গেল প্রতীকের, দেবিকাকে জড়িয়ে ধরে ওও গলা মেলালো তাতে।

(শব্দ সংখ্যা(১০০-

॥সোলমেট॥

মামারবাড়ি বেড়াতে এসেছে সৃজনী ছুটিতে মায়ের সঙ্গে বারো ক্লাসে পড়ার সময়ে। এসেই আশেপাশের জায়গায় ঘুরতে ব্যস্ত হয়ে গেছে মামাতো দাদা দিদিদের সঙ্গে। একদিন সন্ধেবেলায় ফিরে এসে দেখল বাড়িতে মা, দিদা কেউ নেই, মায়ের ছোটমামার বাড়িতে গেছে দেখা করতে। মা আর দিদা ফিরলেন রাত সাড়ে নটায়। ফিরে এসে মা খুব খুশি, কিছুদিনের মধ্যে মায়ের ছোট ভাই চন্দনের প্রাণের বন্ধু পীযুষ যাচ্ছে তিন মাসের ট্রেনি হয়ে সৃজনীর বাবার অফিসে। পীযুষ যাদবপুরের কেমিকাল ইঞ্জিনারিং এর ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট, ভীষণ ভালো পড়াশোনায়। মা আর দিদা দুজনেই পীযুষকে খুব স্নেহ করেন কারণ পীযুষকে ওঁরা ছোটোর থেকে চন্দনের সঙ্গেই বড়ো হতে দেখেছেন।

যথাসময় সৃজনী, ওর বোন সৃষ্টি আর মা ফিরে এলো ওদের বাবার কর্মস্থলে ভাইজাগে। তার কয়েকদিন পরে এক রবিবার ওরা সকালের জলখাবার খাবে, সৃজনী লুচি বেলছে আর মা ভাজছেন এমন সময় তাদের ফ্ল্যাটের বেল বাজল। সৃজনীই উঠে দরজা খুলল, খুলে দেখে একজন অপরিচিত অল্পবয়সী ছেলে মাকেই খুঁজছে। সৃজনী মাকে ডেকে দিল, মা এসে “ওমা তুই, আয় আয় ভেতরে আয়” বলে হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একেবারে তাদের ডাইনিং হলের টেবিলে এনে বসালো। সাধারণতঃ বাইরের লোক এলে তাঁকে ড্রয়িং রুমেই বসানো হয়। একে ওইভাবে সমাদরে ভেতরে নিয়ে আসতে সৃজনী আর ওর বাবা দুজনেই অবাক হল। মা কিন্তু সৃজনী আর ওর বাবা অমিতকে আলাপ করালো “এই সেই পীযুষ” বলে। তার আগে মা অনেকবার সুখ্যাতি করেছেন পীযুষের আর বলেছেন “কোলকাতার ছেলে, তায় ইঞ্জিনিয়ার, ও এখানকার কাউকে পাত্তাই দেবে না দেখিস।” মা আলাপ করানোর পরে সৃজনীকে বললেন সবাইকে খাবারটা দিয়ে দিতে। সৃজনী দিল, মা আর বাবা দুজনেই অনেক গল্প করল সারাদিন পীযুষের সঙ্গে, শেষে ঠিক হল পীযুষ প্রতি শুক্রবার ট্রেনিংয়ের সেরে চলে আসবে সৃজনীদের বাড়িতে আর সোমবারে ওখান থেকেই অমিতবাবুর সঙ্গে চলে যাবে অফিসে। সৃজনীর মাকে পীযুষ বলে ছোড়দি যেহেতু মায়ের মামাতো ভাই সৃজনীর মাকে ছোড়দি বলে আর অমিতবাবুকে ডাকে জামাইবাবু। সৃজনী শুনলো পীযুষ ওর থেকে মাত্র বছর চারেকের বড়ো।

এর মধ্যে কথায় কথায় বেরোলো যে পীযুষ বহুদিন গণনাট্য সংঘের সাথে যুক্ত আছে, ভালো গান করে, আবৃত্তি করে, ভীষণ ভালো সেন্স অফ হিউমার। সৃজনীদের বাড়িতে সবার সঙ্গে একদম মিশে গেল পীযুষ, কিন্তু যেহেতু মামার বন্ধু তাই সৃজনীকে মা বললেন পীযুষকে পীযুষের ডাকনাম ফুচু সেই ফুচুমামা বলতে। সৃজনী পিওর সায়েন্স নিয়ে পড়ছে মা বাবার ইচ্ছেয়, ওর ফিজিক্স আর অংক তেমন সড়গড় নয়, তাই শুনে পীযুষ দায়িত্ব নিয়ে নিল ওকে এই দুটো সাবজেক্ট দেখিয়ে দেবে বলে আর দেখাতেও লাগল। ক্রমে এমন হল

পীযুষ সৃজনীর সঙ্গেই ঘন্টার পর ঘন্টা রাত জেগে গল্প করতে লাগল, সৃজনীর টিউশন থাকে যেদিন সেদিন পীযুষ এসে অপেক্ষায় থাকে ওর সঙ্গে চা বা ডিনার খাবে বলে। সৃজনী নিজে ভালো গান করে, শিখেছেও বহুদিন,রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ, লোকগান খুবই ভালো গায়,আবার ভীষণ রকমের সাহিত্যপ্রেমী, বাংলা, ইংরেজি সাহিত্য দুটোই নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা আছে ওর, ফলে পীযুষের সঙ্গে গান, সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে বসলে দুজনেরই সময়ের খেয়াল থাকে না।

গানে, গল্পে, আড্ডায়, ঘোরায় দেখতে দেখতে তিনমাসের ট্রেনিং পিরিয়ড কেটে গেল ফুচুর। যেদিন ফুচুর লাস্ট ট্রেনিং ডে ছিল, ওকে বেস্ট পারফরমেন্সের সার্টিফিকেট দিল অমিতবাবুর অফিস থেকে। ফুচু সেদিন এলো একদম ওর লাগেজ নিয়ে, ওদের বাড়ির থেকেই ও কলকাতায় ফিরবে, এর মধ্যে ওর ক্যাম্পাস সিলেকশন হয়ে গেল হিন্দুস্থান পলিমারে। পরেরদিন বিকেলে মা বাবা বোন সৃষ্টিকে নিয়ে গেল স্থানীয় বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে। বাড়িতে পীযুষ বা ফুচু আর সৃজনী রইল। ফুচুর হঠাৎ খেয়াল হল ওর ব্যাগের চেনটা কাজ করছে না, সৃজনী সেই শুনে বলল, “চল আমার সঙ্গে, কাছেই একটা দোকান আছে, ওরা এইসব সারায়”, দুজনে গিয়ে চেন সারিয়ে ফিরে এলো। সৃজনী গেল কিচেনে চা করতে। চা করে এনে ফুচুকে দিল, সৃজনী দেখল ফুচু একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে। ও তাড়া লাগালো ফুচুকে চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে বলে, হঠাৎ ফুচু চেয়ার ছেড়ে এসে ওর হাতটা ধরে বলল, “আমায় ছেড়ে থাকতে তোর কষ্ট হবে না, না রে? আমি এতদিন এখানে নিয়ম করে আসতাম শুধু তোর জন্য, সোমবার ফিরে গিয়ে দিন গুনতাম কবে শুক্রবার বিকেলটা আসবে আর তোর সাথে দেখা হবে?” সৃজনী ভীষণ অবাক হয়ে বলল, “হ্যাঁ খারাপ লাগবে তো, কিন্তু তুমি তো এখন চাকরিতে ঢুকবে, কী আর করা যাবে বল, তাছাড়া তুমি কোলকাতার ছেলে, আমার মত প্রবাসী বাঙ্গালী মেয়ের কথা তোমারই কী মনে থাকবে ফুচুমামা?” ফুচু আরো কাছে এসে ওর কাঁধে দুটো হাত দিয়ে বলল, “আমায় বিয়ে করবি? আমি তোকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। এতো বছর কলকাতায় পড়াশোনা করেছি, প্রচুর মেয়ে দেখলাম তো, তুই একদম আলাদা, তোর মধ্যে আগুন আছে। তুই কী আমাকে তোর সারাজীবনের পথ চলার সঙ্গী হতে দিবি?” সৃজনী এতটা অবাক হয়েছে যে ওর কথা বলার অবস্থা নেই, কিন্তু এটাও ঠিক যে ফুচুকে ও কখন নিজের সবচেয়ে কাছের জন ভেবে বসে আছে। কিছুক্ষন চুপ করে থেকে ও বলল, “আমিও যে তোমার মাঝেই আমার সবটুকু দেখেছি, কিন্তু তুমি চাকরি পেয়ে গেলেও আমার এখনো হায়ার সেকেন্ডারিটাও হয়নি আর আমি কিন্তু পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে চাই।” ফুচু বলল, “তুই ‘হ্যাঁ’ বল, আমি তাহলে একটু শান্তি নিয়ে ফিরতে পারি।” সৃজনী নিজের আরেকটা হাত রাখল ফুচুর হাতের ওপরে। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কতক্ষন দাঁড়িয়ে ছিল জানে না, ওদের সংবিৎ ফিরল মা বাবার বেলের আওয়াজে। ফুচু গিয়ে দরজা খুলল।

সৃজনীর মনে বাজতে রইল, “আমারও পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।” সদ্য সতেরোর সৃজনী

তার অপরিণত মনে প্রথমে বুঝতেই পারেনি কখন সে মনে মনে ফুচুর কাছে সমর্পিত হয়ে বসে আছে আর সৃজনীকে প্রথম দেখাতেই ফুচু প্রেমে পড়েছে কিন্তু প্রকাশ করেনি পাছে সৃজনী বা সৃজনীর বাড়ির লোক বাধা দেয়। ভীষণ টেনশনে ছিল ফুচু। আজকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সৃজনীকে প্রপোজ করে ওর সম্মতি পেয়ে ওর মনে হচ্ছে "ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে।" সেদিন রাত্রে সারারাত দুজনের কেউই ঘুমোতে পারল না। নতুন প্রেমের উচ্ছলতায় দুজনেই নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে নানান আকাশকুসুম ভেবে ভেবে রাত কাটিয়ে দিল। পরেরদিন যাবার আগে একটু অবসর দেখে ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ গভীর চুম্বন করল দুজনে দুজনকে।

ফুচু চলে গেল। সৃজনীর সমস্ত পৃথিবীটা মনে হল অন্ধকার হয়ে গেল, খাচ্ছে, পড়াশোনা নিয়ে বসছে, স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু সব আনন্দ যেন চলে গেছে ফুচুর সঙ্গে। বার বার কারণে অকারণে গাইছে, "হৃদয়ের একুল ওকুল দুকূল ভেসে যায়, হায় সজনী, উথলে নয়নবারি" অকারণেই মাঝে মাঝে চোখে জল আসছে, মনে পড়ছে চন্ডিদাসের পূর্বরাগের পদ, "রাধার কী হইল অন্তরের ব্যথা।" ক্রমে ওর পরীক্ষা হল, রেজাল্ট বেরোল, ভালো রেজাল্টই হল সৃজনীর কিন্তু জয়েন্টে চান্স পেল না সৃজনী। ফুচু তাতে খুশি হয়ে বলল, "তুই ডাক্তারি পড়ে ডাক্তার হয়ে যখন বেরোতিস তোর চুলে পাক ধরে যেত, ভালো হয়েছে তুই জয়েন্টে চান্স পাস নি।" ফুচুর সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ আছে, কিন্তু সেখানে খুব সাবধানে চিঠি লিখতে হয় দুজনকেই, মা দুজনের চিঠিই পড়েন। এর মধ্যে কলেজে ইংলিশ অনার্স নিয়ে ভর্তি হল সৃজনী, ফুচু ততদিনে চাকরিতে জয়েন করে গেছে। মজার কথা, ফুচু যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ব্লু হয়ে চাকরিতে ঢুকে প্রথম ছুটি পেল এক বছরের মাথায়, ও কলকাতায় নিজের বাড়িতে না গিয়ে এলো ভাইজাগে সৃজনীদের বাড়িতে। সেখানে কথা প্রসঙ্গে জানালো যে ও ইন্ডিয়ান অয়েল আর ও এন জি সি দুটো জায়গাতেই ইন্টারভিউ দিয়েছে, দুটোতেই সিলেক্টেড, এখন ডিসাইড করতে পারছে না কোথায় জয়েন করবে। সৃজনীর মতামত চাইলে সৃজনী বলল ইন্ডিয়ান অয়েলে জয়েন করতে, তাই করল ফুচু।

দেখতে দেখতে আরো তিনটে বছর কেটে গেল, সৃজনীর এখন এম এ ফার্স্ট ইয়ার। এবারে মা বাবা উঠে পড়ে লেগেছেন মেয়েকে পাত্রস্থ করতে, সৃজনী সংকোচে বলে উঠতে পারেনি ফুচুর সাথে ওর সম্পর্কের কথা। এর মধ্যে বেশ কিছু পাত্র পক্ষ দেখে পছন্দ করে গেছে কিন্তু সৃজনী এম এর ফাইনাল পরীক্ষার নাম করে ঠেকিয়ে রেখেছে বিয়েটা। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে সেও ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকায় সেটেলড। ওর ভীষণ ভয় করছে, যদি আর ফুচুর সাথে দেখা না হয় ওর, কয়েকটা বিনিদ্র রাত চিন্তায় কাটিয়ে শেষে ফুচুকে একদিন ফোন করে ফেলল এস টি ডি বুথ থেকে ফুচুর বালাসোরের পিজিতে এবং বলে ফেলল বাড়ির পরিস্থিতি।

সেদিন বড়দিন, বাড়িতে মা আর সৃজনী মিলে অনেক রকম খাবার বানিয়েছে কয়েকদিন ধরে, কেক, কুকিজ,

প্যাটিস, চিকেন কাটলেট, ফিস ফিঙ্গার। বাড়িটা ষ্টার দিয়ে, আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে, সৃজনী সবই করেছে কিন্তু ওর মন ভালো নেই। সন্ধেবেলায় হঠাৎ বেল বাজল, সৃজনী দরজা খোলার আগেই মা গিয়ে দরজা খুললেন আর তারপরে ভেতরে এলেন ফুচুকে সঙ্গে নিয়ে। ফুচুকে আজকের দিনে বাড়িতে পেয়ে মা বাবা খুবই খুশি কিন্তু ফুচু আজকে ঢুকেই মা বাবাকে প্রণাম করে যে কথাটা বলল তার জন্য তাঁরা একদম তৈরী ছিলেন না। ফুচু ঢুকেই ওঁদের বলল, “আজকে বড়দিন দেখে এলাম তোমাদের কাছে একটা জিনিস চেয়ে নিতে তোমাদের কাছ থেকে। সৃজনীকে সারাজীবনের জন্য আমাকে দেবে? আমি তোমাদের জামাই হিসেবে হয়তো অযোগ্য হব না, কী বলেন জামাইবাবু?” প্রথমে অমিতবাবুর আর সৃজনীর মায়ের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল ফুচুর কথা, তাই তাঁরা বললেন, “তুই সৃজনীর মত নিয়েছিস?” ফুচু কিছু বলার আগে সৃজনী বলল, “আজ থেকে পাঁচ বছর আগেই নিয়ে রেখেছে মা, আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি।” অমিতবাবু আর সৃজনীর মা দুজনেই ওদের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, “এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না, আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম মেয়েটা আমেরিকায় চলে যাবে, কেমন থাকবে না থাকবে, এটা আমরা ভেবেই দেখিনি।” মা বাবার সম্মতি পেতে জানা গেল ফুচুর বাড়ির সবাই খুব খুশি এই বিয়েতে, ফুচু আগেই তাঁদের মতামত জেনে এখানে এসেছে। এবারের বড়দিনটা সত্যিই দুই পরিবারের কাছে খুবই আনন্দের দিন। বাইরে বাজীর আওয়াজ পেয়ে ওরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো হাতে হাত ধরে, দুজনেই উপলব্ধি করল এতদিনে সোলমেট মানে কী, সামনের চার্চের মাইকে বাজছে ক্রিসমাস ক্যারোল, “জয় টু দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য লর্ড হ্যাস কাম” ওদের জীবনে সারাজীবনের মত এই দিনটা স্মরণীয় হয়ে রইল।

॥অপেক্ষা অবসান॥

অপূর্ব যখন কলেজে বি এস সি সেকেন্ড ইয়ার সৌমিলি ভর্তি হোল ফার্স্ট ইয়ারে। কলেজের ক্যাম্পাসে প্রথম আলাপ। প্রথম দেখাতেই অপূর্ব ভালোবেসে ফেলেছিল সৌমিলি নামের এক লাবণ্যময়ী বিদ্যুৎশিখাকে।

সৌমিলি লাবণ্যময়ী, শান্ত, মৃদুভাষী স্বভাবের। মা বাবার একমাত্র সন্তান সৌমিলিদের আদি বাড়ি পুরুলিয়ায়। উচ্চ মাধ্যমিক শেষে বাবার বদলির চাকরির সুবাদে বর্ধমানের ভাড়া বাড়িতে ওরা এসে উঠেছে। এখানে কলেজে পড়ার সময়েই অপূর্বর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়। প্রথম প্রথম অপূর্বর বন্ধুত্ব সৌমিলি কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। হঠাৎ করে অপূর্বকে ভালো লাগার মত তেমন কিছু ওর চোখে পড়েনি। অপূর্ব আর পাঁচটা ছেলের মত সুশ্রী স্মার্ট নয়, তাছাড়া ওর চেহারায় ধনী পরিবারের জৌলুসেরও একান্ত অভাব।

একটা মানুষের সঙ্গে যতক্ষণ না মেশা যায়, ততক্ষন পর্যন্ত তার স্বভাব চরিত্র গুণাবলী কিছুই ভালো করে জানা যায় না। তাই সৌমিলি ধীরে ধীরে অপূর্বকে জানার চেষ্টা করতে লাগল।

সৌমিলি লক্ষ্য করল অপূর্ব কলেজের কিছু গ্রুপডি স্টাফেদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। খোঁজ নিয়ে জানল এদের ছেলেমেয়েদের অপূর্ব বিনাপয়সায় পড়ায় রোজ সন্ধেবেলায়। এছাড়া অপূর্ব টিউশন করে যে টাকা রোজগার করে তার সিংহভাগ ব্যয় করে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সহায়তা করতে। সকাল বিকেল নিয়ম করে বস্তিতে ঘোরে সেখানকার মানুষদের স্বাস্থ্য সচেতন করতে, তাদের জীবনের অসুবিধেগুলো কাটিয়ে উঠতে। কিন্তু এর পেছনে ওর নেই কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ, নেই কোনো আর্থিক লাভ। বর্ধমান এলাকার মানুষের কাছে অপূর্ব পরিচিত তার পরোপকারী স্বভাবের জন্য। যেকোনো মানুষের দরকারে অপূর্ব হাজির আছে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, তা সে কারোকে নিয়ে রাতবিরেতে হাসপাতালে যাওয়া হোক, কিংবা শ্মশানে দাহ করতে যাওয়া হোক, পুরোটাই অপূর্ব করে হাসিমুখে।

কলেজে অপূর্ব জনপ্রিয় ভালো আবৃত্তি করে বলে, ভালো গান গায় আর সমস্ত সিনিয়র আর জুনিয়রদের সবরকম সহায়তার হাত বাড়িয়ে রাখার জন্য। শিক্ষকদের খুব নির্ভরশীলতার মানুষও সে। অথচ ভীষণ প্রচারবিমুখ, মুখচোরা, শান্ত স্বভাবের। তাই সে বারংবার বলা সত্ত্বেও ইউনিয়নে জয়েন করেনি। কিন্তু অপূর্বর চোখের চাহনিতে মুগ্ধতা সৌমিলিকে বলে দেয় অপূর্ব ওর প্রতি সমর্পিত প্রাণ, ওকে ভালোবাসে কিন্তু মুখ ফুটে বলে ওঠা হয়ে ওঠেনি এখনো। সচ্ছল পরিবারের সন্তান সৌমিলি বুঝতে পারে না অপূর্ব এতো সব করেও নিজের পড়াশোনা কিভাবে বজায় রাখে, কারণ অপূর্বর নাম আছে কলেজে ভালো ছাত্র হিসেবে।

আস্তে আস্তে সৌমিলি জানতে পারল অপূর্বদের পৈতৃক ব্যবসা আছে, বর্ধমান স্টেশনে গায়েই ওদের বড়ো কাপড়ের দোকান, সেই দোকান দেখে ওর দাদা আর বাবা। অপূর্ব এতো সাধারণ ভাবে থাকে যে দেখে মনে হয় ওর বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। নিজের লেখাপড়া ও আরো যা কিছু লাগে অপূর্ব চালায় তার টিউশনির টাকা দিয়ে, বাড়ির থেকে একটা পয়সাও ও নেয় না। এইসব খবর সৌমিলিকে দেয় অপূর্বর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরণ্যর প্রেমিকা তিস্তা যে আবার সৌমিলির বন্ধু। কথায় কথায় বেরোলো যে অপূর্ব ভীষণ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ছেলে যে স্বাবলম্বনে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে সর্বতোভাবে। এদিকে ধনী পরিবারের সন্তান হলেও সৌমিলির চিন্তা ভাবনা খুবই স্বচ্ছ। তাই তার বুঝতে অসুবিধে হয় না অপূর্ব আজকে যে অবস্থাতেই থাকুক, পরিশ্রমী বলেই একদিন না একদিন ঠিকই ভালো জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সৌমিলির অপূর্বর প্রতি ভালোলাগায় মুগ্ধতা আর শ্রদ্ধা যোগ হল।

দেখতে দেখতে অপূর্বর ফাইনাল পরীক্ষা চলে এলো আর সৌমিলির সেকেন্ড ইয়ারের ফাইনাল। দুজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে খুব ভালো রেজাল্ট করল। অপূর্ব ভর্তি হল এমএতে, সঙ্গে বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে যে ডাবলুবিসিএস কোচিং দেয় সেখানে কম্পিটিভ পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেয়ে গেল, সেখানেও ক্লাস করতে লাগল। এই কোচিংটা নেন এখানকার রেজিস্ট্রার, কন্ট্রোলার প্রমুখ অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা। সৌমিলির গ্রাজুয়েশন ফাইনাল হয়ে গেল আর অপূর্বর এম এ সেকেন্ড ইয়ার, এই সময় অপূর্ব ডাবলু বি সি এস পরীক্ষায় বসল। তার আগে অপূর্ব সৌমিলিকে প্রপোজ করেছে আর সৌমিলির তাতে সমর্থনও পেয়ে গেছে। এম এ ফাইনাল হয়ে রেজাল্ট বেরোনোর আগেই অপূর্ব ডাবলুবিসিএসে কোয়ালিফাই করে ইন্টারভিউয়ের ডাক পেল এবং কেতুগ্রামের বিডিও হিসেবে জয়েন করল। সৌমিলিও আর দেরী না করে অপূর্বকে কংগ্রাচুলেট করে জানতে চাইল তাদের সম্পর্কের পরিণতি সম্পর্কে। অপূর্ব আপ্লুত হয়ে গেল সৌমিলির বাড়িতে আর দুবাড়ির সম্মতিতেই চারহাত এক হল দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর শেষে। দুটি প্রতীক্ষা রত হৃদয় এক হল পবিত্র বিবাহ বন্ধনে।

॥আনন্দ দিন॥

দুই ভাইয়ের এক বোন মহুয়া। দাদা জয়দীপ আর ছোড়দা সন্দীপের তো বটেই মা সুষমাদেবীর আর বাবা সুখময় বাবুরও ভীষণ আদরের মেয়ে সে। ওদের ভাই বোন সকলেরই পড়াশোনা বাংলা মিডিয়ামে, কিন্তু সবাই পড়াশোনায় ভালো। জয়দীপ তো এক্সট্রা অর্ডিনারি, স্কুলের থেকে রেকর্ড মার্কস নিয়ে পাশ করল মাধ্যমিক, এগারো বারো ক্লাস পড়ল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন,সমস্ত কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় চান্স পেল, ষ্টার নিয়ে পাশ করল উচ্চ মাধ্যমিক। পড়তে গেল খড়্গপুর আই আই টিতে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, সেখানেও ভালো রেজাল্ট করে চাকরি পেল আমেরিকার আটলান্টায়, ছমাস সেখানে থাকবে, ছমাস ভারতে। এরপরে প্রেম করা হয়নি বলে প্রেমে পড়ল বন্ধুর বোন চন্দ্রিমার যে ফিজিক্সে এম এস সি করেছে। চন্দ্রিমাকেই বিয়ে করে আমেরিকাতে রয়ে গেলেও বোন মহুয়ার জন্য তার প্রাণের টান একই রকম আছে। ছোড়দা সন্দীপও ভালোই পড়াশোনায়, সেও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দুর্গাপুরে ভালো চাকরি করছে। আর মহুয়া, সেও পড়াশোনায় ভালোই, পুতুল পুতুল মিষ্টি দেখতে মহুয়াকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

এহেন মহুয়ার জন্য দেখে শুনে বাবা মা বিয়ের ঠিক করলেন নাগপুরের ব্যাংকের ম্যানেজার নিলয়ের সাথে। দাদা জয়দীপ প্রচুর খরচ করল একমাত্র বোনের বিয়েতে। সন্দীপও তার সাধ্যমতো খরচ করল, রীতিমতো নগদ টাকা পয়সা, নমস্কারী, গয়না গাটি, দানের বাসন দিয়ে মহুয়ার সঙ্গে নিলয়ের বিয়ে হয়ে গেল। নাগপুরের বাড়িতে নিলয় থাকে তার মা বাবা আর খুড়তুতো বোনের সাথে। নিলয়ের বাবার চার পুরুষের কাঠের ফার্নিচারের ব্যবসা, নাগপুরের অত্যন্ত ধনী পরিবার তারা। মহুয়ার সঙ্গে বিয়ের পরে পরেই নিলয়ের একটা প্রমোশন হল। মহুয়া লক্ষ্য করল নিলয়ের সে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী হলেও নিলয়ের খুড়তুতো বোন রুমির সঙ্গেই বেশী ঘনিষ্ঠতা যেন নিলয়ের। ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাবার আগে পর্যন্ত নিলয় রুমির ঘরেই কাটায়, আবার ফিরে এসে শোয়ার আগে পর্যন্ত রুমির ঘরেই কাটায়। মহুয়া ভাবল ভাই বোনের এতদিনের সম্পর্ক, সেটা এমন হওয়াই স্বাভাবিক, ওরও তো ছোড়দার জন্য মনকেমন করে। তেমন অমল দিল না সে। এদিকে নিলয়ের ড্রিঙ্ক করার অভ্যেস আছে, একমাত্র মহুয়া ছাড়া ওর শ্বশুড়বাড়ির সকলেই ড্রিঙ্ক করে, সেটাই নাকি হাই সোসাইটির দস্তুর। মহুয়া চুপচাপ শোনে, এমনিতেও সে স্বভাবে খুবই শান্ত আর মিতভাষী। তাই সে শোনে আর দেখে বেশি, বলে কম। এভাবেই মাস দুয়েক গেল।

এক ছুটির দিনে দুপুরে শাশুড়ি ডাকতে বললেন নিলয়কে শাশুড়ির কী একটা দরকারে। মহুয়া রুমির ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ অথচ ভেতরে নিলয়ের উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে তার ছেড়ে রাখা চটিজোড়া দিয়ে। সে ইতস্তত করে ডাকতে যাবে এইসময় শুনল তীব্র আশ্লেষের সঙ্গে মিলনের শিৎকারের আবছা আওয়াজ,

তার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, সে দরজার ফ্রেমটা ধরে নিজেকে সামলে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল একবুক হতাশা নিয়ে। এবার কী করবে সে? মাথাটা পুরো খালি লাগছে তার। এদিকে শাশুড়ি ছেলেকে না পেয়ে কিছু একটা আঁচ করেছেন। তিনি ঘরে এসে নরম সুরে বললেন, "কী ব্যাপার রে তোর? বাবুকে পেলি না বুঝি, ঠিক আছে তুই বিশ্রাম নে, আমি দেখি পরে কথা বলব ওর সাথে।" বলেই তাঁর চোখ পড়ল মহুয়ার মুখের দিকে, চোখে জলের দাগ আর হতাশ মুখ দেখে তিনি মাথায় হাত রেখে বললেন, "আমি এবার বুঝেছি, তুই মন খারাপ করিস না, আমাদের যা আছে তোর কোনো অভাব থাকবে না, শুধু একটু মানিয়ে নে।" বলে বেরিয়ে গেলেন। মনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হোল মহুয়ার, বাপের বাড়িতে ফিরে যাবে না এখানেই থেকে যাবে, ভীষণ দোটানায় পড়ল ও? এমন সময় দাদাভাই জয়দীপ একদিন ফোন করল বোনের খোঁজ নিতে আমেরিকা থেকে। 'বলব না' 'বলব না' করেও বলে ফেলল ও এই ঘটনা। দাদাভাই সব শুনে ওকে বলল মুখে কোনো কথা আর প্রকাশ না করে স্যুটকেস গুছিয়ে ট্রেনে উঠে বসতে, কারণ নাগপুরে নিলয়দের প্রভাব প্রতিপত্তি আছে ভালোই, তাই ওকে পালাতে হবে ওদের মুঠো থেকে ওদের বিন্দুমাত্র জানতে না দিয়ে, আর পারলে যেন ও ওর যাবতীয় গয়নাগাটি নিয়ে চলে আসে।

একটা রবিবার রাত্রে মহুয়া সব গয়নাগাটি ভরে রাখলো স্যুটকেসে, আর একটা ব্যাগে ভরল নিলয়ের আলমারিতে থরে থরে সাজানো নোটের বান্ডিলের বেশ কয়েকটা,সেদিন রাত্রে নিলয় রুমির ঘরে শুয়ে পড়েছে। পরেরদিন সোমবার মহুয়া ভোরের আলো ফোটার আগে এসে দাঁড়ালো নাগপুর স্টেশনে। ভাগ্যক্রমে দুর্গাপুর হয়ে যাবে যে বোম্বে মেল সেই ট্রেন পেয়ে গেল, জেনারেল কম্পার্টমেন্টেই উঠে বসল সে। ট্রেন ছেড়ে ঘন্টা দুয়েক যেতে সে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। পরেরদিন সন্ধ্যেবেলায় নামল দুর্গাপুরে।

কোনোরকমে গিয়ে যখন মা বাবা ছোড়দার সামনে দাঁড়ালো তখন ওর আর শরীরের আর মনের ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মা বাবা আগেই শুনেছিলেন সব জয়দীপের কাছে, ওকে কাছে পেয়ে তারাও স্বস্তি পেলেন। তারপরে বেশ কিছুদিন কোর্ট কাছারির চক্করে ওর কাটল। দুবছর পরে ডিভোর্স হোল, নিলয়রা কিছুই ফেরত দিল না, মহুয়ার বাপের বাড়ি থেকেও খুব কিছু জোর করল না কারণ মহুয়া ওর গয়নার সঙ্গে প্রায় কুড়ি লাখ টাকা নিয়ে এসেছিল ভরে ব্যাগে যেটা আসলে ব্ল্যাক মানি নিলয়দের। তাই সেই টাকার কথা ওরাও আর উল্লেখ করল না। তবু নিলয়ের বাবা খোরপোষ বাবদ মোটা টাকা দিতে চেয়েছিলেন, সুখময়বাবু সবিনয়ে তাঁর অক্ষমতা ব্যক্ত করলেন সে ব্যাপারে। মহুয়ার ডিভোর্স হয়ে গেল যেটার জন্য ও বিন্দুমাত্র দায়ী নয়। রাতারাতি জীবনটা যেন কেমন পাল্টে গেল ওর। অথচ মহুয়ার চাকরি করার মানসিকতা কোনোদিন নেই। সে বরাবরই ভেবে এসেছে গুছিয়ে সংসার করবে, বাড়িতেও সেই চিন্তা ধারতেই বড়ো হয়েছে।

বাবা মায়ের ভালোবাসায় কোনো খামতি নেই, কিন্তু তাদের বুকে কে যেন পাথর চাপিয়ে দিয়েছে, মায়ের সুগার ধরা পড়ল, বাবার হার্টের সমস্যা শুরু হোলমহুয়া ফিরে আসার ছ মাসের মধ্যে। মহুয়া নিজের কাছেই নিজে অপরাধী হয়ে আছে মা বাবার এই হঠাৎ অসুস্থতার জন্য। একমাত্র ছোড়দা সন্দীপ খুব খুশি বোনকে আবার কাছে পেয়ে, নানান মজার কথা বলে, সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে, এটা সেটা এনে ওকে দিয়ে ওর মনটা অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে। বেচারা কিছুতেই বুঝতে পারে না কী করলে বোনটা আবার আগের মত হয়ে যাবে। এরমধ্যে বড়দাদা জয়দীপ এসেছে, বোনকে বলে গেছে কোনো চিন্তা না করতে, ও আমেরিকায় ছেলে দেখছে, সেখানে বোনের বিয়ে দেবে, বোন একদম চোখের সামনে থাকবে।

সেদিন খুব গরম, এমনিতেই দুর্গাপুর শুকনো জায়গা, গরমটা বেশিই পড়ে, সেদিন একেবারে সকাল থেকে বাইরেটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। বাবা আর ছোড়দা অফিসে চলে গেছে, মহুয়া আর সুষমাদেবী খেয়ে দেয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়েছে মেঝেতে ভালো করে ধুয়ে মুছে। তারপরে ঘুমিয়ে গেছে মহুয়া। বেশ কিছুক্ষন পরে সুষমাদেবী উঠেছেন বিকেলে জলের আওয়াজ পেয়ে, মহুয়া ঘুমের মধ্যে অনুভব করছে একটা ঠান্ডা কিছু তার মাথার নীচে, অনুভূতিটা প্রবল হতেই উঠে বসে ও আলো জ্বালাল আর দেখেই শিউরে উঠল, মহুয়া শুয়ে ছিল বালিশের নীচে কুন্ডলি পাকানো একটা গোখরো সাপ নিয়ে যেটা মেঝের ঠান্ডা পেয়ে কুন্ডলী পাকিয়ে তখনো শুয়ে আছে। মহুয়া মাকে ডাকল, সুষমাদেবী তো ভয় পেয়েই অস্থির, কিন্তু ওরা কিছু করার আগেই সেটা চলে গেল আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে।

দেখতে দেখতে দুটো বছর আরো গেল মহুয়াদের পরিবারের। জয়দীপ ঠিক মনোমত ছেলে পাচ্ছে না বোনের জন্য, তাই কিছুতেই এগোতে পারছে না। তায় তারা ঘর পোড়া গরু, অনেক ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে জয়দীপকেও। সন্দীপের সব বন্ধুরা চেনে মহুয়াকে ছোট থেকে, সবাইয়ের খুব সহানুভূতি আছে মহুয়ার ব্যাপারে। এরমধ্যে সুদর্শন অমিতাভ কবে যেন নিজের অজান্তেই মহুয়াকে নিজের মন দিয়ে ফেলেছে। মহুয়া টের পায় অমিতাভর মুগ্ধতা কিন্তু তার বড়ো ভয় করে, তাছাড়া মহুয়ারা ব্রাহ্মণ, অমিতাভরা কায়স্থ, তাই তার ভালোলাগা সে বুঝতে দেয় না।

সেদিন পয়লা জানুয়ারী, নতুন বছরের প্রথম দিন, সেদিন সকাল থেকে ছোড়দা কারণে অকারণে মহুয়ার পেছনে লেগে যাচ্ছে সমানে আর হেসে যাচ্ছে। বেলা দশটা নাগাদ দুটো রিক্সা থামল ওদের বাড়ির সামনে, আর তার থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, অমিতাভ আর ওর ভাই অসিতাভ। চারজনেই ওদের বাড়িতে ঢুকল। সেদিন মহুয়ার বাবার ই সি জি হবে বলে তিনি বাড়িতে আর ছোড়দা সন্দীপ নিয়ে যাবে বাবাকে তাই সেও ছুটি নিয়েছে। বাবা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন অমিতাভর বাবা সুবিমলবাবুর দিকে। এবারে সন্দীপ

এগিয়ে এসে ওঁদের ভেতরে এনে বসালো। তারপরে সুবিমলবাবু সুখময় বাবুর কাছে হাত জোড় করে বললেন, “আমি অমিতাভর বাবা, আমাদের সবায়ের মহুয়া মাকে খুব পছন্দ কিন্তু যেহেতু আপনারা ব্রাহ্মণ তাই বলতে সংকোচ হচ্ছে, তাছাড়া আমার ছেলে যদিও ভালোই চাকরি করে এ এস পিতে কিন্তু আপনার ছেলেদের মত উচ্চ শিক্ষিত নয়, সাধারণ এম এস সি পাশ অংক নিয়ে। আমরা মহুয়ার সব ঘটনা জেনে শুনেই এসেছি, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে আমরা আজই পাকা কথা বলে দিন স্থির করে যেতে চাই। এবারে আপনারা বলুন আপনাদের অভিমত।” সুখময়বাবু আর সুষমাদেবী দুজনেই অভিভূত হয়ে গেলেন সুবিমলবাবুর মহানুভবতায় আর ব্যবহারে, সুখময়বাবু জয়দীপকে ফোন করলেন সঙ্গে সঙ্গে, একদম পরিচিত পরিমন্ডলের পরিবার বলে আর অমিতাভকে খুব ভালো ভাবে অনেকদিন ধরে চেনে বলে জয়দীপ এক কথায় রাজি হোল এই প্রস্তাবে।

অনেকদিন পরে বাড়িতে খুশির বান ডাকল। ঠিক হোল ফেব্রুয়ারীর পাঁচ তারিখে বিয়ে হবে। বিয়ে হোল, মহুয়া খুব সুখেই কাটাতে লাগল জীবন, এক বছর পরে মহুয়ার মেয়ে হোল সেটাও পয়লা জানুয়ারিতে। মেয়ে, অমিতাভ শ্বশুর শাশুড়িকে নিয়ে দিন কাটতে লাগল ওর। দেখতে দেখতে মেয়ে বড়ো হোল, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে গেল, সেটাও পয়লা জানুয়ারি। দুবছর পরে ফিরে হায়দরাবাদে চাকরিতে ঢুকল সেটাও পয়লা জানুয়ারি। তাই মহুয়ার জীবনে পয়লা জানুয়ারী বেশিরভাগ সময়ে হ্যাপিই হয়েছে, আনন্দ দিন হয়ে রয়েছে।

॥ক্ষনিত্র কথন (খুন্তি)॥

বড্ডো ভালোমানুষ এই নন্দিনীটা, সারাদিন শুধু লোকের মন রাখতে ওর দিন কেটে যায়। একবারও কী বোঝে আমার কষ্টটা, আমাকে দিয়েই তো ওর সব নাড়াচাড়া, রান্নাবান্না। মাছ বলো, বড়া বলো, সব্জি বলো, রুটি বলো সব আমাকে দিয়েই তো সারে। ডিমের ওমলেট করলে উল্টোতে গেলেই আমাকে খোঁজে। নন্দিনীকে আমিও বড়ো ভালোবাসি, কী সুন্দর প্রতিটা রান্না নামানোর আগে যত্ন করে আমার বুকে একটুখানি নিয়ে টেস্ট করে দেখে স্বাদ ঠিক হল কিনা। আবার বাড়ির কেউ জানেনা যেটা সেটা আমি জানি, সব রান্নার বসানোর সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করবে নন্দিনী, তুই তো এমনিই অপূর্ব রাধিস, অতো ঈশ্বরকে স্মরণের কী আছে রে তোর, হ্যাঁ? ওর ধারণা ঈশ্বর স্মরণ করে নিলে সব ভালো হয়।

লকডাউনে কাজের লোক ছিল না, একা হাতে রান্না, ঘরের কাজ, সাবান কাচা, বাসন ধোয়া, বুড়ো শাশুড়িকে যত্ন করা সব করত। কী পরিশ্রম হত ওর, এক একদিন খেতে বসে খেতে পারতো না ক্লান্তিতে, কিন্তু বড়ো পরিষ্কার বাতিক ওর, সব মেজে, ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতেই হবে। মাঝে কদিন পেটের গন্ডগোল গেল ওর, রান্না করতে পারছিলই না, আমাকেও আর লাগেনি। একটা কথা চুপিচুপি বলে রাখি, আমারও কিন্তু নন্দিনীর হাতে থাকতেই ভালো লাগে। কেন জানো....ও যে আমাকে ব্যবহার করে মেজে ধুয়ে শুকনো করে তুলে রাখে। নন্দিনী আমাকে হাতে নিলে তাই আমিও ম্যাজিক দেখাই আর লোকে খেয়ে খুব সুখ্যাতি করে নন্দিনী, আমিও তো চাই ওকে সবাই ভালো বলুক, সত্যি ও প্রশংসার যোগ্য লোক।

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম আমাকে নিয়ে এলো দোকান থেকে দেখে শুনে ও, সেখানে আরো অনেকে ছিল, কারো বুকটা গোল, কারো চৌকো, কিন্তু আমার মত চেটকানো আর কেউ না, নন্দিনীর আমাকেই মনে ধরল, আর দেখো কত বছর হয়ে গেল ওর সাথে আছি আমি। নন্দিনীরও আরো দুটো খুন্তি আছে কিন্তু ও যখন রাঁধবে আমাকেই ধুয়ে নেবে। সেদিন আমাকে গ্যাসের ধারে রেখে আনাজ কাটছিল, বোঝেনি আমি তেতে গেছিলাম, আর যেই আমাকে ধরেছে, সঙ্গে সঙ্গে হাতে ছেঁকা খেয়েছে, এত্তো বড়ো দুটো ফোস্কা উঠে গেল, ওর কষ্ট দেখে আমিও কেঁদেছি। বেচারা, এতো অন্যমনস্ক হলে হয়!!!

আজকে বাড়িতে বেশ কিছু লোকের নিমন্ত্রণ, ভাগ্নে জার্মানি চলে যাবে বলে মামী আর মামা খেতে বলেছে ভাগ্নেদের, তার মা বাবাকে, সঙ্গে ছোটো দেওরের পরিবার, ভাসুরের পরিবার আর নন্দিনীর বোনের পরিবার। সব মিলিয়ে পঁচিশজন লোক তো হবেই, আগের দিন থেকে প্রস্তুতি নিয়ে সময়মতো সকলকে খেতে দিল। ভাগ্নেরা, নন্দিনীর বোনের ছেলে ওরা এমনিতেই নন্দিনীর রান্নার ভক্ত, ভাসুরের ছেলেও ভালোবাসে কাকিমার

রান্না, আজকে নন্দিনীর একেবারে “ধন্যি ধন্যি” করতে লাগল লোকে ওর রান্না খেয়ে, নন্দিনী সবাই চলে গেলে আমাকে যত্ন করে ধুয়ে মুছে শুকনো করে রেখে দিয়ে নিজের মনেই বলল, “আমার ঠাকুরের জন্য আর খুন্তির ম্যাজিকের জন্যই এসব সম্ভব হয়।” আমারও গর্বে বুকটা ভরে উঠল। এইজন্যই না ওকে আমি এতো ভালোবাসি।

BANGLADARSHAN.COM

॥হেমন্ত রাগ॥

মধ্যপ্রদেশের উসবাই গ্রামের থেকে তিন কিলোমিটার এগিয়ে সোনাডহর গ্রাম, এখানে এসে পৌঁছল পরিক্রমাবাসী গৌরীশঙ্কর নর্মদার কিনারা ধরে, এসে উঠল একদম সোনাডহর ঘাটে।বেলা সাড়ে তিনটে বাজে, সদাব্রত থেকে চাল ডাল নিয়ে খিচুড়ি রাঁধবার সময় এসে দাঁড়ালো সেখানে সোনাডহর গ্রামের বৃদ্ধ সুজনরাম। তিনি বিকেলে নর্মদার তীরে মা নর্মদাকে দর্শন করতে এসেছেন। তিনি গৌরীশঙ্করকে বললেন বিকেলে সোনাডহর ঘাটের ধর্মশালায় ওখানকার আধিকারিক বিদ্যানন্দজী এলেই সে আশ্রয় পেয়ে যাবে ধর্মশালাতে। কথায় কথায় উনি জানালেন খাড়েশ্বরী মহারাজের কথা যিনি বিদ্যানন্দজীর গুরু ছিলেন।

এই সোনাডহর নর্মদা পরিক্রমাবাসীদের কাছে জনপ্রিয় তার স্বর্ণলিঙ্গের জন্য যা এখন মা নর্মদার গর্ভে। সিদ্ধসাধকগণ এইখানে ওই লিঙ্গের দর্শন পান মা নর্মদার কৃপা হলে। শেষ এই লিঙ্গের দর্শন পেয়েছিলেন ধুমানন্দ অবধূত যিনি খাড়েশ্বরী মহারাজ নামে এই অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন, তাঁর ছিল অতুল যোগ ঐশ্বর্য যা তিনি লোককল্যাণের কাজে লাগাতেন। নর্মদা মায়ের এই ঘাটে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ঘাট আছে, স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলোনীয়। গৌরীশঙ্কর ঘাটের সিঁড়িতে বসে ভাবতে থাকে সুজনরামজির বর্ণিত খাড়েশ্বরী মহারাজের কথা। একটু পরে এসে যান বিদ্যানন্দজী অবধূত। এসে তিনি ওকে ডেকে নিয়ে ধর্মশালার ঘর খুলে ওর থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। গৌরীশংকর শোনে খাড়েশ্বরী মহারাজের কথা।

মধ্যপ্রদেশ আয়োগের নরসিংহাপুর জেলার সেচ বিভাগের সরকারি আধিকারিক ছিলেন শ্রীউমাশঙ্কর দুবে। ভীষণ বলিয়ে কইয়ে, পশ্চিমী ভাবধারায় বিশ্বাসী দুবেজী সর্বদা কোট টাইতে শোভিত-প্যান্ট-হয়ে চলাফেরা করতেন সাহেবী কায়দায়। নর্মদা পরিক্রমাকারী ও নর্মদাতীরের সাধু মহাত্মাদের তিনি মনে করতেন অলস, নিষ্কর্মা। একবার সরকারের সেচের কাজ গ্রামে পরিদর্শনের জন্য তাঁর আগমন ঘটে সোনাডহরে ষাটের দশকে। সেইসময় এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন উচ্চকোটির সাধক অমিতানন্দজী ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ। তাঁরা তখন সাতদিনের জন্য এখানে অধিষ্ঠান করছিলেন নর্মদা পরিক্রমা কালে। সময়টা পুজোর ঠিক পরে। অমিতানন্দ অবধূতের পরিক্রমাকারি দলের সঙ্গে দেখা হয় দুবেজীর এবং দুবেজী তাঁদের দেখে প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করলেন। অমিতানন্দজীকে বললেন পরেরদিন যেন তিনি পরিদর্শনে এসে এই নিষ্কর্মা সন্ন্যাসীদের দলকে এখানে না দেখেন। অমিতানন্দ মুচকি হেসে সম্মতি দিলেন। অমিতানন্দজী তাঁর শিষ্যদের বললেন “তোমরা এবারে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে একটা পরিবর্তন।”

পরেরদিন সরকারি সার্কিট হাউসে বসে আছেন উমাশঙ্কর দুবে, এমন সময় তাঁর কানে আসে একটা ভজন

“কাহে রে বন খোঁজন যায়, সর্বনিরন্তরী সদা আলেপা তোহী সঙ্গ সমাই”, হেমন্ত রাগে গাওয়া এই গানটা হেমন্তের সায়াহ্নে বসে শুনতে শুনতে হৃদয়ে কেমন যেন একটা অপ্রাপ্তির বেদনা চারিয়ে গেল দুবেজীর। গানটা শুনতে শুনতে দুবেজী ভেতরে যেন কেমন একটা অদ্ভুত টানাপোড়েন শুরু হল, সারারাত্রি তিনি ঘুমোতে পারলেন না, তাঁর জীবনের এই সময়টা যেন দাঁড়িয়ে গেছে থমকে ওই ক্ষণে। পরেরদিন ভোরের আলো ফোটার আগে দুবেজী হাজির হলেন গিয়ে সোনাডহর ঘাটে, কিন্তু ঘাটে বা তার আশেপাশে কেউ নেই। সোনাডহর ঘাটের নর্মদা মন্দিরের পুরোহিত জানালেন অমিতানন্দজী ও তাঁর শিষ্যরা ভোররাত্রে উঠে তাঁদের যাত্রার সূচনা করে এগিয়ে চলে গেছেন। দুবেজী প্রথমে খুবই মুষড়ে পড়লেন আর গ্রামের লোক ভাবলো আবার কোনো অপমান বা শাস্তি দেওয়ার জন্য দুবেজী ওই সন্ন্যাসীদের খুঁজছেন। কিছুক্ষন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি ফিরে এলেন সার্কিট হাউসে, বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন বেলা একটা পর্যন্ত চুপচাপ, একটা চিঠি লিখে চৌকিদারকে বলে দিলেন তাঁর উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দিতে, তারপরে জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

অমিতানন্দজী সশিষ্য চলেছেন এগিয়ে নিমাবার, বরিয়া ঘাট হয়ে পাশি ঘাটের দিকে। আপন ভজনানন্দ ডুবে আছেন আপনাতে, শিষ্যরা শিবস্তোত্র গাইতে গাইতে চলেছেন। তাঁরা পাশি ঘাটে পৌঁছে ডেরাডান্ডা রেখে নিজেদের আসন লাগিয়ে মা নর্মদার পূজন সেরে ভোজন প্রসাদী প্রস্তুত করলেন এবং মা নর্মদাকে নিবেদন করে প্রসাদ পেলেন। বেলা চারটে নাগাদ হঠাৎ একটা জিপ এসে থামলো পাশি ঘাটে। দুবেজী নেমে তখন গিয়ে বসলেন অমিতানন্দজীর কাছে, তাঁকে দেখে অমিতানন্দজী সানন্দে অভ্যর্থনা করলেন এমনভাবে যেন তাঁর আসবার কথাই ছিল। তাঁকে ভোজন প্রসাদী দিয়ে ভোজন করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কি ব্যাপার? আমি তো আপনার আদেশ মেনে ছেড়ে চলে এসেছি সোনাডহর, আবার কি অপরাধ হল যে আপনি এখানেও চলে এলেন শাস্তি দিতে?” দুবেজী কিছুক্ষন চুপ করে থেকে অমিতানন্দজীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন তাঁকেও তাঁদের পরিক্রমাকারীর দলে নিতে। অমিতানন্দজী অনেক বোঝালেন এই পথচলার কঠিন ব্রত সম্পর্কে কিন্তু দুবেজী অনড় রইলেন তাঁর পরিক্রমার সংকল্পে এবং বার বার পায়ে পড়ে সাশ্রু নয়নে নিজের আগের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইতে লাগলেন। অবশেষে অমিতানন্দজী সম্মতি দিলেন তাঁর নর্মদা পরিক্রমার যাত্রায়। পরেরদিন ওই চল্লিশজন অবধূত সন্ন্যাসীদের দলের সঙ্গে পরিক্রমার চলা শুরু হল দুবেজীর কোট প্যান্ট পরে কিন্তু কপর্দকশূন্য অবস্থায়।

আস্তে আস্তে দিন পনেরো চলার পরে তাঁর কোট প্যান্ট ভীষন বোঝা মনে হতে লাগল দুবেজীর, মাস দেড়েক তবু রইলেন ওই বস্ত্রে, তারপরে একদিন কোট আর প্যান্ট দুটোকেই নর্মদার গর্ভে নিঃক্ষেপ করলেন, এখন তাঁর পরনে শুধু অন্তর্বাসটুকু। দেখতে দেখতে তিনশো কিলোমিটার চলার পরে দুমাসের মাথায় তিনি কৌপিন মাত্র সার করে চলতে চলতে এসে পৌঁছলেন হোসেঙ্গাবাদের আগে নর্মদার ঘাটে। সেখানে বসে আছেন একদিন দুপুরে, একটি ছোট মেয়ে তাঁর বাবাকে ডাকতে এসেছে ঘাটের নৌকো থেকে, তাঁর বাবা নৌকোর

মাঝি, সে এসে বলল, “বাবা, বেলা শেষ হয়ে এলো, আর সময় নেই, এইবেলা শিগগির আপন ঘরে চলো, অনেক দেরী করেছো, আর বিলম্ব করো না নিজের কাজে।” খুবই সাধারণ কথা, কিন্তু দুবেজীর মনে হল যেন মেয়েটির মুখ দিয়ে মা নর্মদা এই বিলম্ব না করার আদেশ দিলেন, মনে করিয়ে দিলেন যেন আর সময় নেই তাঁর হাতে। আনমনা হয়ে ঘাটের কিনারে বসে তিনি শুনলেন কোথা থেকে যেন বড়ে গোলাম আলী খাঁয়ের ঠুংরী “ইয়াদ পিয়াকি আয়ে” যেটি হেমন্ত রাগে আধারিত ভেসে আসছে আশ্চর্য এক মনকেমন করা আবহ নিয়ে, সময়টা যেন থমকে গেছে। এক অদ্ভুত নির্লিপ্তি ও বৈরাগ্যে অন্তর ছেয়ে গেল তাঁর। অনুপম অনাবিল না পাওয়ার বেদনায় মন তাঁর ভারাক্রান্ত হয়ে গেল, চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল, একটু পরে অমিতানন্দজী তাঁকে ডাকলেন আর তিনি গিয়ে আপনার মন বুদ্ধি অহংকারকে তাঁর পায়ে সমর্পণ করতে চেয়ে দীক্ষা চাইলেন তাঁর কাছে। অমিতানন্দজী তাঁর মস্তকে হাত রেখে আশ্বস্ত করলেন, কয়েকদিনের মধ্যে দুবেজী দীক্ষিত হলেন শিবমন্ত্রে।

ক্রমে ক্রমে পথ চলতে চলতে নর্মদা মায়ের তোয় মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিব্যসত্তার অনুভব হতে লাগল দুবেজীর। গুরু সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে তাঁর চেতনার স্তর উন্নীত হতে লাগল, পাঁচ বছর পরে তাঁদের পরিক্রমা শেষ হল সেই সোনাডহরে এসে। এখানে ব্যাসদেবের শিষ্য, শ্রীমদভাগবতের অন্যতম প্রবক্তা ঋষি ও বেদের প্রতিশাখ্য রচয়িতা ঋষি শৌনক তপস্যা করেছিলেন। তাই এই স্থান ভীষণ জাগ্রত। সংকল্প সিদ্ধির পুজো দিয়ে তিনি অমিতানন্দজীর সাথে গেলেন ওমকারেশ্বর, সেখান থেকে গুরুর সঙ্গে শেষ করলেন দ্বিতীয়বারের পরিক্রমা। দ্বিতীয়বার পরিক্রমা শেষে তাঁকে অমিতানন্দজী দিলেন সন্ন্যাস দীক্ষা, বিরজা হোম করে তিনি হলেন সন্ন্যাসী ধুমানন্দ অবধূত। শুরু হল তাঁর সোনাডহরে নর্মদা তীরে পিপল গাছের নিচে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সাধনা, টানা এগারো বছর তাঁর এই সাধনা চলল, এই এক পায়ে দাঁড়িয়ে সাধনা করার জন্য স্থানীয় লোকজনের কাছে তাঁর নাম হল খাড়েশ্বরী মহারাজ, এই এগারো বছর সময় তিনি এক অদ্ভুত নির্লিপ্ত অবস্থায় ছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন তিনি অমিত যোগবিভূতির অধিকারী হয়ে। অমিতানন্দজীর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য তিনি, অমিতানন্দজী তাঁকে আপন সন্তান মনে করেন। একদিন নর্মদায় নেমে গুরুকৃপায় তিনি দর্শন পেলেন স্বর্ণলিঙ্গের আর স্বয়ং মহাদেবের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলেন। ক্রমে নর্মদা মা ও মহাদেবের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন আশ্রম, মন্দির ও ধর্মশালা।

তাঁর অলৌকিক বিভূতির কথা এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, সন্তানহীনের হল সন্তানলাভ, মৃত্যুপথযাত্রী পেল জীবন, দরিদ্রের হল ধনপ্রাপ্তি, আশ্রয়হীন পেল বাসস্থান তাঁর করুণায়, বহু অনাথ, আতুরের তিনি হলেন আশ্রয়স্থল। তাঁর যোগবিভূতিতে বহু মানুষ উপকৃত হলেন ওই সময়ে। একদিন তিনি বসে আছেন আশ্রমে এক গায়ক এসে তাঁকে গান শোনাতে চাইল, তাঁর শিষ্য বিদ্যানন্দ সেই গায়ককে নিয়ে গেল খাড়েশ্বরী মহারাজের কাছে, সে বসে শুরু করল গান হেমন্ত রাগে “তুম বিন জীবন কেয়সা জীবন”, আবার মহারাজের ভেতরে নাড়া

পড়ল, আবার মনে হল অনেক সময় ধরে তিনি রয়েছেন পৃথিবীতে নিজের ইষ্ট, নিজের গুরুকে ছেড়ে। তখন তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়স, পরেরদিন তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর ব্রহ্মলীন হবার দিন। ১৯৮৬ সালে দিন সময় বলে তিনি বসলেন যোগমুদ্রায় এবং সেই নির্দিষ্ট ক্ষণে তাঁর প্রাণবায়ু ব্রহ্মতালু ভেদ করে উর্ধলোকে বিলীন হল, পড়ে রইল তাঁর নশ্বর দেহ, তিনি ব্রহ্মলীন হলেন। এখন সেই আশ্রম, ধর্মশালা ও মন্দির দেখাশোনা করেন তাঁর শিষ্য বিদ্যানন্দ অবধূত। এখনো তাঁর যোগ ঐশ্বর্যের কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে।

হেমন্ত রাগ একটা এমন রাগ যা অন্তর ও বাহিরকে শান্ত করে মনকে এক অপার প্রশান্তিতে ভরে দেয়, অনন্তের প্রতি যেন আহ্বান করে অন্তরাত্মাকে, সময়ের কালস্রোত যেন থমকে যায় ওই রাগের সময়। বার বার তিনবার জীবনের তিনটি সময়ে এই হেমন্ত রাগ উমাশঙ্কর দুবেজীর প্রবৃত্তির প্রেয় জীবজীবনকে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত করে নিবৃত্তির শ্রেয় শিবজীবনে উন্নীত করে তাঁকে উচ্চকোটির মহাত্মা খাড়েশ্বরী মহারাজ বা ধুমানন্দ অবধূতের এক জ্যোতির্ময় জীবন দান করল যা এখনো সেই অঞ্চলের লোক শ্রদ্ধাবনত হয়ে স্মরণ করে। সময়ের স্রোত সতত বহমান, সময়ে সঠিক কর্ম কিন্তু সেই স্রোতে মানুষের সুকর্ম আর সাধনার ফল মিশিয়ে মানবজীবনকে করে তোলে মহাজীবন, তাঁর লোককল্যানের ব্রত আঁচড় রেখে যায় সময়ের আবর্তে, মানুষের মনের মনিকোঠায় পাতা হয়ে যায় তার শ্রদ্ধার আসন,মানবতার সেবাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড়ো সেবা।

BANGLADARSHAN.COM

॥ইষ্টকৃপা॥

নর্মদার দক্ষিণতীর ধরে এগিয়ে চলেছে ইয়াদরাম আর দেবেন, এরা দুজনেই নর্মদার পরিক্রমা করছে বিগত তিন মাস ধরে, ইয়াদরামের সঙ্গে দেবেনের এক সপ্তাহ আগে দেখা হয়েছে। তারপর থেকে আজ ছদিন তারা একসাথে চলছে। ইয়াদরাম হরিদ্বারের গায়ত্রীতীর্থ শান্তিকুঞ্জের ব্রহ্মচারী আর দেবেন দীক্ষিত কিন্তু সন্ন্যাসী নয়। আজকে ওরা মধ্যপ্রদেশের শংকর নদী পেরিয়ে যাবে ওপারে নৌকোতেসেই নৌকোর জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে . রইল কিছুক্ষণ, নৌকো এলে দুজনে পেরোলো শের সঙ্গম, পৌঁছল অপর পাড়ে। হাঁটতে হাঁটতে দুজনে পৌঁছল সিদ্ধ কালিকাঘাটে, এক মাঝি ওদের বলল ওপরে একটি আশ্রম আছে যেখানে পরিক্রমাবাসীদের ভোজন প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পায়ে পায়ে দুজনে এসে দাঁড়ালো সেই আশ্রমে।

আশ্রমের নাম নর্মদা নন্দিনী সেবা আশ্রম। মাতাজীর নাম সাদ্ধী শ্যামা দিদি। তিনি ওদের আজকের দিনটা আশ্রমে থেকে যেতে অনুরোধ করলেন এবং গাড়িতে উঠলেন গ্রামে যাবেন বলে। বলে গেলেন দেড় ঘন্টার মধ্যে ফিরবেন। ভোজন প্রসাদী শেষের পরই উনি ফিরে এলেন। জানালেন গোবর দিয়ে ধূপ ও অন্যান্য জিনিস যেমন প্রদীপ, ওয়াল প্লেটহ্যাঙ্গিং / ইত্যাদি প্রস্তুত করেন ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়েদের শেখান, গোবর দিয়ে রাসায়নিক সারের জায়গায় গোবর দিয়ে অর্গানিক ফার্মিং করতে উৎসাহিত করছেন এবং শেখাচ্ছেন। অনেক কথা হল ওদের সাথে।

অযোধ্যার মেয়ে শ্যামা ছোট থেকেই ভগবানের প্রতি সমর্পিত প্রাণ, তাঁর যখন ষোলো বছর বয়স তখন অযোধ্যার হনুমানগড়ি বৈষ্ণব আখড়ায় দীক্ষা হল রাম মন্ত্রে। কঠোর সাধনা চলল তাঁর। উত্তপ্রদেশের ওই অঞ্চলে একটা মেয়ে বিয়ে না করে সাধন জীবন বেছে নেবে এ বড়ো সহজ কথা ছিল না সেই সময়ে। কিন্তু মা বাবা তাঁর সহায় হলেন, পাঁচ ভাই বোনের সর্বকনিষ্ঠ শ্যামাকে মা বাবা আগলে আগলে চললেন আরো কুড়ি বছর। তারপরে তাঁরা একে একে গত হলে ভাইয়েদের ভরসায় না থেকে তিনি পরিব্রাজনা শুরু করলেন। পরিব্রাজন করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন নর্মদা তটে, তিনবার করলেন নর্মদা পরিক্রমা যার মধ্যে একবার করলেন একদম মায়ের কিনারা ধরে, সিদ্ধিদাত্রী মা নর্মদা ওঁকে কৃপা করলেন। আমাদের শাস্ত্রমতে গঙ্গার স্নানে মুক্তি আর নর্মদার দর্শনেই মুক্তি। সিদ্ধক্ষেত্র তপোভূমি নর্মদার তীরে আরো দশ বছর সাধনা করে উনি নর্মদা মায়ের দ্বারা আদিষ্ট হলেন এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে। আশ্রম প্রতিষ্ঠা হল।

উনি মাটি আর গোবর দিয়ে ধূপ, ওয়াল হ্যাঙ্গিং, শোপিস, প্রদীপ এইসব শেখাতে লাগলেন স্থানীয় গ্রামের

মহিলাদের আর কৃষিজীবী গ্রামের কৃষকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন চাষের জন্য গোবর সার ব্যবহার করতে । দেড়শোটি গরু নিয়ে খুললেন গোশালা, যার দুধ, দই, ঘি সব স্থানীয় মানুষেরা কিনে নেয় আর গোবর ব্যবহার হয় ওই হস্তশিল্প করতে আর আশ্রমের চাষের কাজে। কারণ রাসায়নিক সারে তৈরী ফসলে শরীরে অনেক রোগের জন্ম হয় আর ধূপে রাসায়নিক ব্যবহারে যে ধোঁয়া তা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। বিগত তিরিশ বছর ধরে চলছে ওঁর এই নিরলস পরিশ্রম, আজ ওঁকে ওই অঞ্চলের লোকজন তো বটেই তাঁর নিজের পরিবারের ভাইবোন সকলে অসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখে। উনি হয়ে উঠেছেন বহু মানুষের আশ্রয়স্থল, গ্রামের মহিলারা যেহেতু তাঁর জন্য স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে তাই তারা তাঁকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করে, তিনি নিজেও ওদের কল্যাণের জন্য নিবেদিত প্রাণ। দেবেনকে তিনি বসে বসে নিজের এই কর্মকান্ডের বিবরণ দিলেন। পরেরদিন ঘুরিয়ে দেখালেন তাঁর ওয়ার্কশপ, তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ঈশ্বরের আশীর্বাদ মাথায় থাকলে যে কি করা সম্ভব দেবেন দেখে অবাক হল ।শ্যামাদিদি জানালেন তিরিশ বছর ধরে সাধনপথে আছেন। এমন কত জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ হয়ে গেছে পরমাত্মার পরশে আর অনন্তের আহ্বানে আমাদের এই পুণ্যভূমি সনাতন ভারতেএদের দেখা পেতে হলে যেতে হবে নিজেদের নিরাপত্তার বেষ্টনি ছেড়ে আমাদের দেশের প্রত্যন্ত !!!! অঞ্চলে যেখানে চাষী, কামার, কুমোর, মুচি, বণিক, মিস্ত্রি, মজুরের ঘামের সঙ্গে মিশে আছে তাদের অপার হৃদয়বত্তা, তাদের উদারতা, আধ্যাত্মিকতা। আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী হল ওঁর সঙ্গে দেবেনের, শ্রদ্ধায় অবনত দেবেন কথা দিয়ে বিদায় নিল পরেরদিন যে ভবিষ্যতেও ওঁর সঙ্গে দেবেনের যোগাযোগ থাকবে।

॥অরুনিমার অপেক্ষা॥

কয়েক দিন ধরে খুব মনখারাপ ছোট্ট অরুণিমার। সাত বছরের অরুণিমার সবে ক্লাসে ওঠার পরীক্ষা শেষ হলো পরশুদিন। প্রত্যেকবার ওর পরীক্ষার পরে ও মা বাবার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যায় এই সময়ে। গতবছর ওরা গেছিল পাঁচমারি। খুব আনন্দে কেটেছিল দুসপ্তাহ ওদের, সঙ্গে আবার মাসীমণি, মেসোমশাই আর মাসির ছেলে রিয়ানও গেছিল। খুব কদিন দুই ভাইবোনে মিলে হুটোপুটি করে মজার সময় কেটেছিল ওদের।

এবারে মাসীমণির শরীর খারাপ, রিয়ানের এখনো পরীক্ষা হয়নি, আবার দিদান আর দাদুন গেছিল গোপালপুর, তারাও নাকি সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কাল রাত্রে মাম্মা বাবাইকে বলেছিল আর কাঁদছিল। বাবাই মাম্মাকে অনেক বুঝিয়ে আজকে বেরোল সকালে, একটু পরে ফিরে এলো, এসে মাম্মাকে কিসব বলল অরুণিমা বুঝলো না একটু পরে মাম্মা এসে ওকে বলল খুব দরকারি কিছু .জামাকাপড় একটা ট্রলিতে নিয়ে নিতে। ও জিজ্ঞেস করল যে ওরা কি বেড়াতে যাবে, মাম্মা বলল ওরা দিদান দাদানদের আনতে যাবে গোপালপুর। পরেরদিন ওরা ভোরে বেরিয়ে ট্রেনে উঠল, ওর কিন্তু ভালোই লাগছিলো যেতে কিন্তু মাম্মার চিন্তিত মুখটা দেখে ওর খুশিটা ও সেভাবে প্রকাশ করতে পারছিল না। বাবাই কিন্তু ওকে খুব আনন্দে রাখার চেষ্টা করছিল। সন্ধের পরে রাত্রে ওরা পৌঁছল গোপালপুর। গাড়ি নিয়ে স্টেশন থেকে দিদানদের হোটেলে পৌঁছলো ওরা যখন তখন বেশ রাত, মাম্মা ওকে বাবাইয়ের কাছে রেখে গেল দিদানের কাছে, ও বাবাইয়ের সঙ্গে তার মধ্যে খেয়ে নিয়ে ঘুমের দেশে।

পরেরদিন ওর ঘুম ভাঙলো একদম ভোরবেলায়, তখনো কুয়াশায় ঢাকা চারিদিক। ও জানলার পর্দাটা একটু সরিয়ে দেখলো বাইরেটায় আলো ফুটছে, সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে কিন্তু কুয়াশার জন্য কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। মাম্মা আর বাবাই গভীর ঘুমে। ও কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে দেখে আবার শুয়ে পড়ল।

তারপরে ওর যখন ঘুম ভাঙলো,তখন ঘরেতে ওর গা ঘেঁষে দিদান আর দাদান বসে আছে আর দিদানের গায়ের সেই মিষ্টি “দিদা” “দিদা” গন্ধটা ও পাচ্ছে। দিদান আলতো হাতে ওর চুলে বিলি কাটছে। ও উঠে বসে বাইরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল দেখে উত্তাল সমুদ্রে সূর্যের রশ্মি পড়ে সোনা সোনা রঙের জলের ঢেউ যার মাথায় মাথায় ফেনার মুকুট তীরে আসছে আর যাচ্ছে, সমুদ্রের ধার ঘেঁষে প্রচুর বড়ো বড়ো বোল্ডার পড়ে আছে, সমুদ্রের বুকে উড়ছে কিছু সামুদ্রিক পাখি, জলের ধারে ধারে সরু সরু লম্বা ঠ্যাংয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা, সাদা কালো সব বকগুলো।

ঘরেতে মাম্মা, বাবাই, দিদান, দাদান হেসে হেসে কথা বলছে। ওর মনে হলো কি মিষ্টি একটা সকাল আজকে ওর কাছে এসেছে আরো আনন্দ হলো শুনে যে বাবাই আর দাদান মিলে ঠিক করছে !!!পরেরদিন ওরা রম্ভা যাবে বেড়াতে। ও অবাক হয়ে মাম্মাকে জিজ্ঞেস করল, "তবে যে তোমরা বললে দিদান দাদান অসুস্থ?" উত্তরটা দাদান দিল "অসুস্থ হয়েছিলাম আমরা, ওষুধ খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে ঠিক আছি, তাই তো অরুকে নিয়ে ভাবছি রম্ভা ঘুরে আসার কথা।" অরুণিমা আনন্দে দিদানের গলা জড়িয়ে একটা হামি খেয়ে দিয়ে একপাক নেচে নিল আর মনে মনে বলল, "এমন একটা মিষ্টি সকালেরই অপেক্ষায় ছিলাম আমি এক্সাম শেষ হবার পরে।" মাম্মা এসে ওকে জড়িয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে হাতে ব্রাশটা ধরিয়ে দিল দাঁত মাজার জন্য।

BANGLADARSHAN.COM

॥আহ্লাদী॥

সন্ধে সাড়ে ছটায় বৈকালিক চা আর চায়ের অনুসঙ্গ হিসেবে পকোড়া, পাঁপড়ভাজা নিয়ে ব্যালকনিতে এসে সুহাসিনী বসলেন শঙ্করের পাশে। সময়টা ফাল্গুন মাস, সদ্য সরস্বতী পুজো গেছে, আর গেছে শংকর আর সুহাসিনীর বিবাহবার্ষিকী, পরস্পরের খুবই মনের মিল তাঁদের। দুই ছেলে মেয়ে তাঁদের, মেয়ে স্নিগ্ধা বড়ো, বিবাহিতা, দুই পুত্র কন্যার গর্বিত জননী সে, ছেলে সৌম্য ছোট, বিবাহিত কিন্তু বৌয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সেই নিয়ে সুহাসিনী আর শঙ্কর একটু মনোকষ্টেও আছেন। দেখতে দেখতে বেয়াল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবন একসঙ্গে কাটিয়ে ফেললেন তাঁরা। শংকর জমিদার পুত্র, নারীঘটিত দোষ তাঁর নেই, তাঁর দুটো নেশা খাওয়া আর বেড়ানো। দুটোতেই স্ত্রী সুহাসিনীর পূর্ণ মদত আছে। তাই শঙ্করের চেহারা বেশ ভারীর দিকে। পাড়ায় সবাই শঙ্করের ভক্তবিশেষ তাঁর দিলখোলা স্বভাব, মার্জিত রসবোধ আর ইতর ভদ্র নির্বিশেষে আপন করে নেওয়া গুণের জন্য। সুহাসিনীকে শংকর ডাকেন “আহ্লাদী” বলে, সুকুমার রায়ের আহ্লাদী কবিতার “হাসছি মোরা হাসছি দেখো হাসছি মোরা আহ্লাদি”র একদম প্রতিরূপ হচ্ছে সুহাসিনী, মুখে শঙ্করের ওপরে রাগ দেখালেও মনে মনে খুব খুশি হন সুহাসিনী তাঁকে ওই নামে শংকর ডাকলে, শঙ্করের প্রণয়ের আভাস মেলে এই ডাকে, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের আভাস দেয় ওই ডাক।

BANGLADARSHAN.COM

চা এবং টা সহযোগে তাঁদের নানান সুখদুঃখের কথা চলছে এমন সময় নীচে বেল বাজালো কেউ। সুহাসিনী উঠতে যাবেন এমন সময় হুড়মুড় করে ঢুকলো এসে মেয়ে স্নিগ্ধা তাঁর দুই ছানা নিয়ে। তারা এসেই দাদুর গা ঘেঁষে বসে পড়ল। সুহাসিনী গেলেন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। স্নিগ্ধা জানালো আগামী পরশু তার কন্যার জন্মদিন, সেদিন বাবা, মা, ভাই যেন অবশ্যই সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে যায়। স্নিগ্ধা কথা বলতে বলতেই সৌম্য ঢুকলো, দিদির কাছে সব শুনে সে বলেই দিলো সবাইকে নিয়ে সে ঠিক হাজির হয়ে যাবে। স্নিগ্ধা গেল তার ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রায় দশটায়, সৌম্য গিয়ে এগিয়ে দিয়ে এলো ওদের।

শঙ্করের পৈতৃক বিশাল বাড়ি, বাগান পুকুর সহ, বাড়ির আরেকটা দিক বিয়ে বা অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়, সেখানে লেগেই আছে অনুষ্ঠান, আর বাড়ির সংলগ্ন ফাঁকা জমিতে আছে গ্যারেজ যেখানে বিরাট মাঠে আগে পাড়ার ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট খেলতো, এখন সেখানে গাড়ি থাকে, মিনিবাস, ট্রাক থাকে, বাড়ির রাস্তার ওপরে সামনের দিকে গোটা তিরিশেক ঘর দোকানঘর হিসেবে ভাড়া দেওয়া আছে। পুকুরে রাজঁহাস আছে, পানকৌড়ি আছে, বাড়ির ভেতরেও একটা দিকে বিরাট খাঁচায় বহু পাখি রাখা আছে যাদের শংকর নিজের হাতে খাওয়ান এখনো। এখন শঙ্করের বয়স আটষট্টি। নিজে কিছুই দেখেন না, বেশিরভাগ এই সম্পত্তির দেখাশোনা করে অ্যাডভোকেট ছেলে আর বৌ সুহাসিনী, ছেলের অ্যাডভোকেট চেম্বারটাও বাড়ির একতলায়।

পরের পরেরদিন নাতনির জন্মদিন, সকালে হাল্কা ঝোল ভাত খেয়ে শেষ দুপুরে সবাই গেল মেয়ে স্নিগ্ধার বাড়িতে। বেশ কিছু লোকজন বলেছিলো মেয়ে জামাই, নয় নয় করেও একশো জন, কেক কাটা হল, এলাহী খাওয়া দাওয়া হল, অনেকের সাথে দেখা হল। মাটন হয়েছিল, শংকর বার দুয়েক মাটন খেলেন দেখে সুহাসিনী বললেন যে মাটন তো শঙ্করের হাই কোলেস্টেরল আর হাই প্রেসারের জন্য বারণ। শংকর আশ্বস্ত করলেন বাড়িতে ফিরে জেলুসিল খেয়ে নেবেন। সৌম্যর সঙ্গে ওঁরা ফিরলেন রাত এগারোটায় সেদিন।

শংকর শুয়ে পড়লেন এসে, কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না শরীরের অস্বস্তির জন্য, উঠে জেলুসিল খেয়ে অনেকটা জল খেলেন, সুহাসিনী মৃদু অনুযোগ করলেন এই বয়সে রাত্রে এতো বেশী খাবার জন্য। শংকর চুপ করে শুনলেন, সত্যিই তিনি কাজটা একটু হটকারীর মতোই করেছেন আজকে, কিন্তু কি করবেন, লোভ সামলাতে পারলেন না যেবেশ কিছুক্ষন এপাশ ওপাশ করে শেষে ভোররাত্রে ঘুমোতে পা !!!রলেন দেখে সুহাসিনী আশ্বস্ত হলেন।

সকালের চা দুজনে বসে খেলেন ব্যালকনিতে, ভোরের আলোর শীতল ছোঁয়ায় শঙ্করের বেশ আরাম হচ্ছে। টুকটাক কথা বলতে বলতে চা খেয়ে গেলেন পাখিদের খাওয়াতে। হাতে দানার কৌটো নিয়ে গিয়ে দানা ছড়িয়ে দিচ্ছেন শঙ্কর, হঠাৎ সুহাসিনী একটা প্রবল শব্দ পেলেন নীচের ঘরে কিছু পড়ার, ছুটলেন তিনি ওপরে, ছেলেও নিজের চেম্বার ফেলে ছুটে এসে দেখেন শংকর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছেন পাখিদের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নিয়ে ছুটল ছেলে এবং পাড়ার কয়েকজন বি এম বিড়লাতে, তার আগে অবশ্য ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান বলেছেন “স্ট্রোক।” ছেলে গেল শঙ্করকে নিয়ে আর সুহাসিনী ছুটলেন ঠাকুরঘরে।

ঘন্টা খানেক পরে বেলা নটায় গৃহসহায়িকা বকুল এসে সুহাসিনীর কাছে দাঁড়ালো, সৌম্যরা ফিরে এসেছে। শঙ্কর আর নেই। শুনে মুহূর্তে মনে হল সুহাসিনীর পায়ের তলায় যেন মাটি নেই। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ডাক্তার এসে তাঁকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে গেল। তারপরে মেয়েজামাই এসেছে-, অন্য আত্মীয় পরিজন এসেছে, সুহাসিনী কিচ্ছু জানেন না। শঙ্করকে দাহ করে যখন সবাই ফিরে এসে সন্ধেবেলা কথা বলছে তখন সুহাসিনীর ঘুম ভাঙলো, মনে হল তাঁকে যেন শংকর বললেন, “বাবা কি ঘুম তোমার আহ্লাদী!!!” প্রথমে কিছুই মনে পড়ল না, হঠাৎ ভাবলেন বাড়িতে এতো লোকজন কেন? এমন সময় স্নিগ্ধা এসে তাঁকে তুলে একগ্লাস গরম দুধ ধরল মুখের কাছে। তিনি দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হলেন, আস্তে আস্তে আবার দিন গড়াতে লাগল।

প্রায় একমাস কেটে গেছে শঙ্করের যাবার পরে, কাল অবধি লোকজন ছিল, আজকে সব ফাঁকা। সন্ধেবেলায় চা নিয়ে সুহাসিনী বসেছেন সেই ব্যালকনিতে। মনে পড়ছে তাঁর প্রথম বৌ হয়ে এসে কালরাত্রির সন্ধেয় একান্তে

এই বারান্দায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে শঙ্করের চোখে দেখা মুগ্ধতা, এখানে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে বসে গল্প করা, দিনের শেষে শঙ্করের প্রতীক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চোখ বিছিয়ে রাখা, প্রথম সন্তানসম্ভবা হওয়ার খবর শঙ্করকে এখানে চুপিচুপি দেওয়া, মেয়ে হওয়ার পরে এখানে মেয়েকে শঙ্করের কাছে রেখে কাজ সারা, মেয়ে একটু বড়ো হওয়ার পরে তাকে এখানে বসিয়ে পড়ানো, ছেলের জন্ম, তাদের বড়ো হওয়া, তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া, শঙ্করের সঙ্গে বসে একটা একটা করে কাটানো কত স্মৃতিমেদুর বিকেল, কত আবেগঘন রাত্রি, তাঁদের দাম্পত্যের এক অবিছেদ্য অঙ্গ হয়ে থাকা এই ব্যালকনিতে জড়ানো কত ফেলে আসা ক্ষণ!!!

এই প্রথম তিনি অনুভব করছেন নিজের বোধে, অনুভূতিতে শঙ্করের অনুপস্থিতিটা। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে এই প্রথম সুহাসিনী অনুভব করলেন কতখানি নিঃসঙ্গ, একা হয়ে গেলেন তিনি দুজনের একসাথে শুরু করা !!! দ্বৈত জীবন আজকে শঙ্করের আকস্মিক প্রয়াণে হঠাৎ পরিণত হয়েছে তাঁর একক নিঃসঙ্গ উষর যাপনে। এক অনির্বচনীয় নিঃসঙ্গতা গ্রাস করতে লাগল তাকে আর সেই নিঃসঙ্গতার অভিঘাতে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন তিনি। অনুভবে বুঝতে পারলেন আর কেউ রইল না তাঁর মান অভিমান নিয়ে বিচলিত হতে, তাঁর সামান্য শরীর খারাপে আর কেউ ব্যাকুল হয়ে অস্থির হবে না, আর কেউ তাঁকে একান্তে কোনোদিন ডাকবে না “আহ্লাদী” বলে। এগুলো যত মনে হতে লাগল ততো তাঁর কান্নার দমক বাড়তে লাগলো যার সাক্ষী হয়ে রইল একাকী নিঃসঙ্গ ব্যালকনিটা, তাঁর মত এই ব্যালকনিটাও আজ থেকে একাকী নিঃসঙ্গ। দুচোখের অবিশ্রাম অশ্রুধারায় উজাড় হয়ে যেতে লাগলো সুহাসিনীর সদ্য সাথীহারানোর ব্যথা।

॥রাগালাপ॥

কলকাতা থেকে পলাশপুর গ্রামের বিদ্যুৎ বিভাগের সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছে তখন বছর খানেক হল কুনাল মুখার্জী। কলকাতার অভিজাত পরিবারের ছেলে সে, মেধাবী, সুদর্শন, অন্তর্মুখী, একসময় মনপ্রাণ ঢেলে টানা দশ বছর সেতার শিখেছিল, কিন্তু পরে ক্যারিয়ার, চাকরির যাঁতাকলে তার সুরের সাধনা মাথায় উঠেছে। চাকরির প্রথম পোস্টিং থার্মাল পাওয়ারের এই অজ গ্রামে। এখানে সবে বিদ্যুতের খুঁটি বসানো হচ্ছে। এখানকার বিদ্যুৎবিভাগের পুরো ব্যবস্থাপনার আধিকারিক হিসেবে এসেছে সে, কোয়াটার তৈরী হয়নি তখনো, আছে অফিসের কাছে এক সহকর্মীর দেখে দেওয়া ভাড়া বাড়িতে, সে থাকে একতলায় দুটো ঘর, একফালি বারান্দা, রান্নাঘর আর বাথরুম নিয়ে, রান্নাবান্না করে দিয়ে যান স্থানীয় সুরমাদি, বাজারহাটটাও তিনিই করেন, কুনালের অলিখিত অভিভাবক তিনি। দোতলায় থাকে বাড়িওয়ালা, বয়স্ক দম্পতি, ছেলে মেয়েরা বাইরে থাকে তাদের। কুনাল পনেরোদিন কি একমাস অন্তর একবার বাড়ি যায় দুদিনের জন্য, মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখানকার জীবনে সে।

BANGLADARCHAN.COM

সেদিন সকালে তাঁর ঘুম ভাঙলো এক অপূর্ব সুরমূর্ছনায়, কে যেন মন প্রাণ ঢেলে গাইছে ভৈরবীতে একটা মনকাড়া বন্দিশ তানকারী করে , “শ্যামসুন্দর মদনমোহন জাগো মোরে লাল।” কে গাইছে এমন গান? নারীকণ্ঠ কিন্তু অদ্ভুত সুরেলা সেই গলা, শুয়ে শুয়ে শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যাচ্ছে কুনাল। নিজের ছোটবেলার রেওয়াজ মনে পড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষন রেওয়াজের পরে থেমে গেল সেটা। কুনাল শয্যাত্যাগ করে এসে দাঁড়ালো বারান্দায় কিন্তু ঠাহর করতে পারল না কোথা থেকে গানটা ভেসে আসছিলো। এরপরে সারাদিনের কাজের স্রোতে ভুলেই গেল সে ওই বন্দিশের কথা।

আবার পরেরদিন একই সময়ে শুরু হল রেওয়াজ, তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে মনটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল, আবারও রেওয়াজ শেষ হতে বারান্দায় এসে খুঁজতে লাগলো উৎসটা কিন্তু ততোক্ষণে থেমে গেছে গান। পরেরদিন ছুটির দিন, ও ঠিক করল পরেরদিন ও খুঁজে বের করবে গানের উৎস। পরেরদিন রবিবার, একটু আলসেমি করে শুয়ে ছিল বেলা পর্যন্ত, শুয়ে শুয়ে আবারও সুরের দোলায় দুলছিল কুনাল এমন সময় যথারীতি বেল বাজিয়ে কাজ করতে এলেন সুরমাদি।

কুনাল আজকে সুযোগ বুঝে সুরমাদিকে জিজ্ঞেস করল যে কে রোজ সকালে গলা সেধে রেওয়াজ করে তার বাড়ির পাশে? সুরমাদি বললেন, “ও তো পূবালী গো, সমরবাবুর মেয়ে, খুব লক্ষ্মী মেয়ে, মা মরা মেয়ে, বাপের খেয়াল রাখে মায়ের মত করে, কি যত্ন করে বাপেরওর বাবা সমরবাবু স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার !!!,

আপনি তো চেনেন তাঁকে, তিনি আজ এই দিন পনেরো স্কুলের কাছে হবে বলে এখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে উঠে এসেছেন। মেয়েটা এম এ পাশ, সেও বাপের মতো মাস্টারি করে, তবে ছোট্ট থেকে গান ওর ধ্যান জ্ঞান। রোজ সকাল বিকেল ও রেওয়াজে বসবেই। কত ছেলে দেখে পছন্দ করেছে কিন্তু গানের রেওয়াজ রাখতে পারবে না ও আর বাপকে কে দেখবে তাই বিয়ে করেনি পূবালী।" সেদিন বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় বসে চায়ের কাপ হাতে নিয়েছে কুনাল, শুনলো পুরিয়া ধানেশ্রীতে গলা সাধছে সেই বামাকণ্ঠ। গোধূলির সময়ে সায়াহ্নের এই রাগ পুরো পরিবেশটা যেন পাল্টে দিয়েছে। তার বাড়ির দুটো বাড়ি পরে রবীনবাবুর বাড়ির একতলা থেকে আসছে আওয়াজটা, গেটের কাছে গিয়ে আবছা দেখতেও পেল এক নারীর অবয়ব কুনাল।

পরের সপ্তাহে বাড়ি গেল কুনাল, ফেরার সময় কি মনে করে সেতারটা নিয়ে এলো অনেক ঝামেলা পুইয়ে। তারপরে রোজ সেও রেওয়াজে বসতে আরম্ভ করল বহুদিন পরে সকাল বিকেল, প্রথম প্রথম একটু জড়তা থাকলেও আস্তে আস্তে সে স্বমহিমায় বাজাতে শুরু করল এবং আবার সুরের নেশায় বুঁদ হতে লাগলো। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এক এমনি সম্পদ যে এর ভেতরে একবার ঢুকতে পারলে জীবনের বোধটাই যেন পাল্টে যায়। দুই বাড়ির একতলায় ভোরে যেন সেতার আর কণ্ঠসংগীতের আলাপ চলতে লাগলো প্রত্যহ।

BANGLADARSHAN.COM

সেদিন অফিসে গিয়ে শুনলো কুনাল দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে দোলের দিন সন্ধ্যায় একটা জলসার আয়োজন করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেখানকার স্কুলে আর সেখানে কুনালকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন জেলাশাসক সেতারবাদনের। কুনাল অবাক হলেও 'না' করতে পারলো না জেলাশাসকের পদমর্যাদা বুঝে কিন্তু বুঝতে পারলো না তার একান্তের সাধনার খবরটা জেলাশাসকের কর্ণগোচর কে করল। তার সহকর্মীরা তাকে সমীহ করে, সম্ভ্রমের দূরত্ব তাদের সঙ্গে তার, তবে কে এই উপকারটা করল কিছুতেই বুঝতে পারলো না সে। দোলপূর্ণিমার দিন সকালে সে রেওয়াজ করল, তারপর আস্তে আস্তে সন্ধের মুখে গিয়ে উপস্থিত হল স্কুলের হলে, তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন স্কুলের হেডমাস্টারমশাই সমরবাবু। জেলাশাসক অনির্বাণ গাঙ্গুলি এগিয়ে এসে নিয়ে গিয়ে বসালেন ওকে সামনের অতিথিদের সারিতে।

একটু পরেই অনুষ্ঠানের সূচনা হল একটি বাচ্ছা মেয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে, তারপরে স্থানীয় আরো দুজন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলো, এরপরে নাম ঘোষণা হল পূবালী চৌধুরীর। কুনাল দেখলো তার সেই আবছা দেখা নারীমূর্তি স্টেজে উঠে বসল হারমোনিয়াম নিয়ে এবং সহজ ভঙ্গিমায় ধরল বসন্ত মুখারি রাগে ভজন-"জল যমুনাকে নিকসি ওরি" এবং স্বচ্ছন্দ স্বকীয়তায় তান বিস্তার করে অপূর্ব সুরজাল সৃষ্টি করল, তারপরে একটা ছোট খেয়াল গাইল রাগ মারুবে-হাগে এবং শেষ করল ভৈরবীর বন্দিশ "দয়ানী ভবানী" দিয়ে, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ তার অপূর্ব কিন্নরী কণ্ঠে। পূবালীর গান শেষ হতে জেলাশাসক জানালেন পূবালী তার মামাতো বোন এবং পূবালীর কাছ থেকে কুনালের সেতার রেওয়াজের কথা শুনেই তিনি কুনালকে অনুরোধ করেছেন এখানে

সেতারবাদনের। এরপরে কুনাল উঠল বাজাতে, সে শুরু করল প্রথমে রাগ বাহারের আলাপ দিয়ে, তারপরে জোড় ঝালা বিস্তার বাজিয়ে পরিবেশন করল রাগ বসন্ত বাহার। যেহেতু বসন্ত ঋতুর রাগ বসন্তকালে বাজালো-কুনাল, তাই তার প্রভাব পড়ল সকলের মনে, টানা দেড় ঘন্টা বাজিয়ে যখন কুনাল তেহাই দিয়ে শেষ করল গোটা হলের সমস্ত শ্রোতারা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে তাকে বাহবা দিতে। কুনাল অভিভূত হয়ে গেল সমজদার শ্রোতাদের ভালোবাসায় আর জেলাশাসক অনির্বাণ এসে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আলাপ করালো পূবালীর সাথে। মিষ্টি চেহারার শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটাকে প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেল কুনালের আর পূবালীর ভালো লাগলো কুনালের নিরহংকার ব্যবহার। সুরের আলাপে এতদিনে বাক্যালাপ ঢুকলো।

এরপরে মাঝে মাঝে দেখা হয় দুজনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, দুচারটে কথাও হয়, কিন্তু তার বেশী কিছু এগোয়নি যদিও দুজনেরই দুজনকে ঘিরে সংগীতকে নিয়ে একটা ভালোলাগা আছে। সমরবাবু মানুষটি ভীষণ আপনভোলা, তাঁকে কুনাল বিশেষভাবে পছন্দ করে তাঁর গভীর জ্ঞান ও সরলতার জন্য। আজকাল সমরবাবু সন্ধে দিকে মাঝে মাঝে আসেন কুনালের বাড়িতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে, ওকে স্থানীয় লাইব্রেরির সদস্যও করে দিয়েছেন, অনির্বাণ এখন কুনালের বেশ ভালো বন্ধু হয়ে গেছে। এমনি একদিন বেশ রাতের দিকে শুয়ে পড়ার সময় হঠাৎ কুনাল শুনলো কেউ তাকে ডাকছে বাইরে থেকে। ও বারান্দায় বেরিয়ে দেখল পূবালী দাঁড়িয়ে আছে অসহায় মুখে, সমরবাবু রাত্রের খাবার খেয়ে উঠে হঠাৎ বুকে ব্যথা করছে বলে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন, তাই পূবালী এসেছে কুনালকে ডাকতে যদি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া যায় বাবাকে সেই সাহায্যের আশায়। কুনাল সঙ্গে সঙ্গে অফিসের গাড়ির ড্রাইভারকে ফোন করে অফিসের গাড়ি নিয়ে আসতে বলে ঘরে তালা দিয়ে ছুটল পূবালীর সাথে সমরবাবুকে দেখতে, পূবালী এর মধ্যে পাড়ার ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছিল, তিনিও এসে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন প্রয়োজনীয় ইনজেকশন দিয়ে, সমরবাবু তখন প্রায় অচেতন।

অফিসের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসতে সমরবাবুকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল কুনাল আর পূবালী। সেখানে পৌঁছতে ডাক্তাররা ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। বাইরে কুনাল বসে রইল পূবালীর সঙ্গে। সারারাত কেটে গেল ওদের হাসপাতালে, সকালে অনির্বাণ এলো খবর পেয়ে এবং ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে এসে বলল যে বাহাত্তর ঘন্টা না কাটলে কিছুই বলতে পারছেন না ডাক্তাররা, তবে ঠিক সময়ে নিয়ে আসা গেছে হাসপাতালে বলে যথাযথ চিকিৎসা শুরু করা গেছে। এই বাহাত্তর ঘন্টা যেন যমে মানুষে টানাটানি চলল, শেষ পর্যন্ত চারদিনের দিন সমরবাবু চোখ খুললেন। তাঁকে সজ্ঞানে দেখে কুনাল বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া করল, এই তিনদিন পূবালীর সঙ্গে সেও হাসপাতাল থেকে নড়েনি। বিকেলে দেখে এলো সমরবাবুকে, অনেকটা স্বাভাবিক তিনি, কিন্তু পরদিন সকালে কুনাল খেয়াল করল তার যেন কিছু ভালো লাগছে না, সে ভাবল হয়তো এই কদিন অনিয়ম হয়েছে তাই। তারপরের দিনও তার সেই সকালের মাধুর্যটা যেন আসছে না, সে রেওয়াজে

বসল কিন্তু রেওয়াজে মন দিতে পারল না।

প্রায় পনেরোদিন পরে সমরবাবু ছাড়া পেলেন হাসপাতাল থেকে, তাঁকে খুব সাবধানে থাকার কথা বলে ছাড়ল হাসপাতালের ডাক্তারেরা, সমরবাবুকে নিয়ে এলো অনির্বাণ। পরেরদিন সকালটা আবার যেন সেই সুর ভরানো সকাল, পূবালীর কণ্ঠের রেওয়াজ আর কুনালের সেতারের রেওয়াজ। এবারে কুনালের মন নাড়া খেল, সে পূবালীর রেওয়াজে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে তার দিনের শুরুতে পূবালীর রেওয়াজের আওয়াজ না শুনলে দিনটা বিস্বাদ লাগে এখন।

কুনাল সেদিন অফিস ফেরত গেল অনির্বানের বাড়িতে এবং সরাসরি পূবালীকে বিয়ের প্রস্তাব রাখল অনির্বাণের কাছে যেহেতু অনির্বাণ পূবালীর দাদা। অনির্বাণ খুশি হলেও পূবালীর মত জানবার জন্য নিয়ে গেল কুনালকে সমরবাবুর বাড়িতে। সমরবাবু তো সানন্দে রাজী হলেন কিন্তু পূবালী এক অদ্ভুত কথা বলল, তার বক্তব্য সারাজীবন কুনালকে ললিতের বন্দিশ শুনিয়ে পূবালীর ঘুম ভাঙাতে হবে। ললিত যেহেতু ঊষাকালীন রাগ তাই কুনাল আগে এটা বাজিয়ে পূবালীর ঘুম ভাঙাবে আর পূবালী তারপরে ভৈরবীতে বন্দিশ ধরবে, “দয়ানী ভবানী।” কুনাল একমুখ হাসি নিয়ে সানন্দে সম্মতি দিতে অনির্বাণ দাদা হিসেবে তৎক্ষণাৎ পূবালীর হাতটা নিয়ে দিয়ে দিল কুনালের করতলে। অচিরেই শুভলগ্নে শুভদিনে বিবাহ সুসম্পন্ন হল কুনাল আর পূবালীর। সুরের আলাপ দাম্পত্যে রূপ নিল।

আজকে কুনাল আর পূবালীর ষোলো বছরের বিবাহবার্ষিকী, সমরবাবু এখন দুই নাতি নাতনির দাদু যারা একজন চোদ্দো আর একজন দশ বছরের। কুনাল পূবালীর চোদ্দো বছরের ছেলে কৃশানু মায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিচ্ছে আর দশ বছরের মেয়ে পুর্বিতা বাবার কাছে সেতার শিখছে আজকে পাঁচ বছর ধরে। একা মানুষ সুরমাদি আজও ওদের অভিভাবক, তবে আজকে ওরা আছে নিজেদের বাড়িতে কোলাঘাটে, কুনালের মাও রয়েছেন ওদের সাথে, কুনাল কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ারের বেশ উচ্চপদে আসীন আর পূবালী সেখানকার স্কুলের সিনিয়র টিচার। অনির্বাণ,যে এখন মেদিনীপুরে পোস্টেড কর্মসূত্রে, সপরিবারে আমন্ত্রিত আজকের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে তার ছেলেমেয়ে স্ত্রীসহ বোনের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে। ঘরোয়া অনুষ্ঠান, জনা তিরিশ আমন্ত্রিত, সেখানে প্রথমে কুনাল পূবালীর মেয়ে পুর্বিতা বাজালো কাফি রাগ আর ছেলে-কৃশানু গাইলো খাম্বাজ রাগে বন্দিশ। তারপরে পূবালী গাইলো জৌনপুরী রাগের ওপরে একটা বন্দিশ আর কুনাল বাজালো রাগ কেদারের আলাপ। রাগ রাগিনীর আলাপের রেশ নিয়ে সুরের মূর্ছনায় বেজে চলেছে তাদের দাম্পত্যের যুগলবন্দী যার ধারা প্রবাহিত তাদের আগামী প্রজন্মের মধ্যেও।

॥ফিরে পাওয়া॥

মৌখালীর সবিতা মন্ডলের আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না, আচমকা এক ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে তার জীবনটা ওলোটপালোট হয়ে গেল যেন। বিয়ে হয়ে ইস্তক ভরা সংসার তার, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদ, বর নিয়ে নয় নয় করে সাত আটজনের সংসার, বর্ধিষ্ণু পরিবার, জমিজিরেত, হালবলদ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, গাছে আর ক্ষেতে ঘেরা বাগান নিয়ে শ্বশুরবাড়ির অবস্থা নিয়ে তার গরবের শেষ ছিল না। তায় আবার বর অজিত তাকে চোখে হারাতো, শ্বশুর শাশুড়িও ভালোই বাসতো, মাধ্যমিক পাশ করে এগারো ক্লাসে পড়া দেওর সুজিত তো সমবয়সী, বন্ধুর মত আর ননদ রানী সারাক্ষণ “বৌমণি”, “বৌমনি” করে পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করত, যেন নিজের ছোট বোন একটা।

সবিতা মাধ্যমিক পাশ, আরো পড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাবা হঠাৎ বিয়ে দিয়ে দিল অভাবের সংসারে একটা পেট কমবে বলে আর নিজের দায়িত্ব সেরে ফেলবে বলে। কালোর মধ্যে মিষ্টি চেহারার মেয়েটার বিয়ে হয়ে দুবছরের মাথায় ছেলে সোনু হল। আর তারপরেই শুরু হল ঝামেলা। দেওর সুজিত গ্রাজুয়েট হয়ে চাকরি পেল উড়িষ্যার শতাপদাতে, সেখানে গিয়ে বছর ঘুরতে বিয়ে করে সেখানেই থেকে গেছে। বাড়িও আসেনা, বাড়ির খোঁজও করেনা, টাকা পাঠানো অনেক দূরের ব্যাপার। অজিতদের মাছের ব্যবসা, অজিত প্রায়ই যায় জেলেদের সাথে মাছ ধরতে, যদিও অজিতরাই মহাজন কিন্তু অজিতের বড়ো জলের নেশা। ছেলের জন্মে পর থেকে সে সপ্তাহে একদিন বাড়িতে আসে কিনা সন্দেহ এমন টান তার জলের। ছেলের আট বছর বয়স যখন, তখন একবার এমন ট্রলার নিয়ে গেছিল মাছ ধরতে, সেবারে রেডিওতে বার বার বারণ করছিল বড়ো ঘূর্ণিঝড় আসছে বলে, সবিতা, অজিতের মা বাবা কত বারণ করল, সে কানেই নিল না। জাফর, আব্দুলদের সাথে ভেসে পড়ল ট্রলার নিয়ে, তারপরে সেই ঝড় এলো, সমস্ত মৌখালী সেই ঝড়ে লন্ডভন্ড হল, কিন্তু সেই ট্রলারও ফিরল না, অজিত আর তার সঙ্গীরা আর ফেরেনি। দেখতে দেখতে আজ দু বছর হয়ে গেল অজিতের খোঁজ নেই। সেই শোকে শ্বশুর মারা গেল আর শাশুড়ির মাথার গন্ডগোল দেখা দিল, জমিজিরেত সব জ্ঞাতিরা অনেকখানি ঠকিয়ে নিয়ে নিল, তবু সবিতা লড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে ননদ রানীর বিয়ে হয়ে গেছে কুলপিতে। সে মাঝে সাঝে আসে বটে কিন্তু তারও বড়ো সংসার, এসে থাকবার প্রশ্নই ওঠেনা তার।

গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান নস্করবাবুদের বাড়িতে কাজ নিয়েছে সবিতা, নস্করের গিন্নির রান্নার জোগাড় করে দেওয়া, রান্না করা, ঘর গুছিয়ে দেওয়া, হাতে হাতে যোগান দেওয়া জিনিস এইসব করে, মুড়ি ভেজে, বড়ি দিয়ে, বাগানের সব্জি কিছু হাটে বেচে সে কোনোরকমে সংসারটা টেনে নিয়ে চলেছে। নস্করবাবুর বড়ো ছেলের চাহনি ভালো ঠেকে না সবিতার, তার সামনে পড়লে মনে হয় তার কেমন যেন গায়ে যথেষ্ট কাপড়চোপড় নেই,

খুবই নোংরা চাহনি, কিন্তু সংসার টানতে হয় সবিতাকে, তাই এড়িয়ে চলে ওই ছেলের সামনে পড়াটা। ছেলে সোনু এখন ক্লাস ফাইভের ছাত্র, একটাই সান্ত্বনা সবিতার ছেলেটার লেখাপড়ায় খুব মাথা, স্কুলের সব মাস্টারেরা খুবই স্নেহ করে ওকে। সবিতা অভাবের তাড়নায় অনেক বই কিনে দিতে পারেনা, কিন্তু স্কুলের শিক্ষকেরা ওকে জোগাড় করে দেন সেসব বই। এখনো বাড়িতে একটু একটু ছেলের পড়া সবিতা দেখিয়ে দিতে পারে, আরো উঁচু ক্লাস হলে হয়তো পারবে না।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে রাতের রান্না সারতে সারতে কারেন্ট থাকলে কখনো সখনো একটু টিভি দেখে ও, শাশুড়ির তো মাথার ঠিক নেই, টিভির সামনে বসেও বিড়বিড় করে কি বকতে থাকে সে। এমনি করেই দিন চলছে ওদের। এরমধ্যে এলো আরেক ঘূর্ণিঝড়, সুন্দরবনের মানুষ এই ঝড়কে নিয়েই বাস করে, তাই ওরা জানে ঘূর্ণিঝড় চলে যাবার পরে বেশ কিছুদিন লাগে সব স্বাভাবিক হতে।

সেদিন এমনি ঘূর্ণীঝড়ের পরে সবে কারেন্ট এসেছে, সন্ধেবেলায় রান্না করছিল সবিতা, ছেলে কোন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে ঢুকল। ঢুকেই টিভি চালিয়ে সবিতার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল টিভির সামনে কি দেখাতে। একী দেখছে সবিতা...!!!বাংলাদেশের একটা জায়গায় একটা নৌকোয় একটা লোকের ইন্টারভিউ নিচ্ছে টিভি থেকে, সেই লোকটা নাকি শেষ ছয় সাতমাস জলে ভেসে রয়েছে, কাঠিসার চেহারা, অনাহারে অসহায়তায় দুর্বলতায় লোকটা কথা বলতে পারছে না...কিন্তু লোকটাকে চিনতে ভুল হয়নি সবিতার, এ যে তার স্বামী অজিত মন্ডল।

অজিত খুব কষ্ট করে কথা বলছে, টিভির লোকেরা বলছে সেই আগের ঘূর্ণীঝড়ের দাপটে অজিতদের ট্রলার দিকভ্রষ্ট হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছিল এবং পরে ডুবে যায়, শেষ মুহূর্তে অজিত জলে ঝাঁপ দেয় জাফরের সঙ্গে, কিন্তু জাফর তলিয়ে যায় জোয়ারে। তাকে উদ্ধার করে ওখানকার মাছধরা নৌকো একটা, কিন্তু সঙ্গে কোনো পরিচয়পত্র না থাকাতে ইন্ডিয়াতে আসতে পারে না, এদিকে স্থলসীমান্ত পেরোনো বিপজ্জনক যদি বি ডি আরের হাতে ধরা পড়ে যায়।সেই মাছধরা নৌকোর জেলেদের সাথে মাছ ধরতে গিয়ে তাদের নৌকো পথ হারায় আবার আর একে একে সবাই মারা যায়, অজিতও মারা যেত, টানা ছমাস জলে ভেসে থেকে নৌকোর খাবার শেষ হবার পরে জলটুকুও ছিল না তার গলায় ঢালার, এমন সময় এই ঘূর্ণীঝড়ে তার নৌকো দমকা হাওয়ার দাপটে টেনে এনে ফেলে এই ইন্ডিয়ার দিকে আর সেই সময় সেটা নজরে পড়ে জলপুলিশের । তারা নৌকো আটক করে মৃতপ্রায় অজিতকে পায় এবং সংবাদমাধ্যমের নজরে আসে ব্যাপারটা। অজিত এই কথাগুলো আগে বলেছে সংবাদমাধ্যমকে, এখন সে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছে। খবরটা দেখতে দেখতে সবিতা হু হু করে কেঁদে ওঠে, ছেলেও কাঁদছে, আহা মানুষটা কত কষ্ট পেয়েছে এমন !!!! সময় সবিতা অনুভব করে তার পিঠে হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে আরো একজন আকুল হয়ে কাঁদছে, সে

অজিতের মা।

হঠাৎ সচেতন হয়ে সবিতার খেয়াল হল তাদের বাড়িতে একে একে জড়ো হয়েছে প্রতিবেশীরা। একটু পরে নস্করবাবু এসে আশ্বাস দিয়ে গেলেন সবিতাদের তাঁর পক্ষে যতোটা সম্ভব হবে, তিনি করবেন অজিতকে ফিরিয়ে আনতে। সেদিন বিনিদ্র রাত কাটলো বাড়ির সবার। পরেরদিন অন্ধকার ফিকে হতেই রানী এলো তার বর আর ছেলে নিয়ে, এসে সেও কাঁদতে লাগলো। রানীর বর সুমন গেল পঞ্চায়েত প্রধান নস্করবাবুর কাছে, সুমনকে নিয়ে নস্করবাবু গেলেন জেলাশাসকের কাছে। বিকেলে সুমন ফিরে এসে বলল যে জেলাশাসক পুলিশের সাথে কথা বলেছেন, এক দুদিনের মধ্যেই অজিত বাড়ি আসবে।

সবিতার যেন মনের মধ্যে কেমন হাঁকপাক করছে, সে এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না তার এহেন ভাগ্য। সত্যি সত্যিই যে অজিত আবার আসবে, আবার তার সংসারটা ভরে উঠবে, তার রংহীন দিনযাপন আবার আদরে সোহাগে ভরে উঠবে সে ভাবতে গেলেই কেঁদে ফেলছে। এই দুবছরে সে কত কি দেখে নিল, জ্ঞাতিশত্রুতা কেমন হয় জানলো, পুরুষের চোখের লালসার, কামনার নজর জানলো, দরিদ্রের অসহায়তা জেনেছে, অসহায়তার সুযোগে সুযোগ নেওয়া লোকজন চিনেছে,ফেলে ছড়িয়ে উদার হাতে বিলানো স্বভাব তার আপনি হিসেবি, মেপে চলা হয়ে গেছে। পিতৃহীন সোনুও বুঝেছে বাপের অনুপস্থিতির মানেটা। তাই মা ছেলে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে কেঁদেই চলেছে। রান্না, খাওয়া রোজের দিনযাপনের কোনো কিছুই আর সবিতাকে দিয়ে যেন হচ্ছে না, ভাগ্যিস রানীটা এসেছিল, সেই সামলাচ্ছে সব।

একদিন বাদ দিয়ে তার পরেরদিন বেলা দশটা নাগাদ একটা জিপগাড়ি এসে থামলো সবিতাদের বাড়ির সামনে। জেলাপুলিশের একজনের সঙ্গে একজন কনস্টেবল ধরে ধরে গাড়ি থেকে নামালো অজিতকে, অজিতকে না বলে তার কঙ্কালকেই বলা ভালো যেন। পুলিশের সেই আধিকারিক জানালেন অজিতের ঠিক হতে অন্তত মাস তিনেক লাগবে সদর হাসপাতালে বলেই দিয়েছে। তার চিকিৎসা চলবে সদর হাসপাতালে, দরকার মত নিয়ে যেতে হবে, আপাতত তাঁরা বাড়ির লোকের কথা ভেবে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন, তাঁদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে সেটা তাঁরা পঞ্চায়েত প্রধান নস্করবাবুকে আর নন্দাই সুমনকে বলে দিয়েছে।

তাঁদের একটু মিষ্টিমুখ করালো রানী, অজিত শুধু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সবিতার দিকে, আস্তে আস্তে লোকজন কমে এলে সবিতা আর সোনু কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সবিতা আর সোনুকে জড়িয়ে ধরল সে, তারও চোখ দিয়ে জল পড়ছে কিন্তু সে এতটাই দুর্বল যে কাঁদার শক্তিটুকুও তার নেই, একটু পরেই নেতিয়ে পড়ল। সবিতা ওই অসুস্থ দুর্বল মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে পরম নিশ্চিন্তে নির্ভরতায় চোখ বুজলো, তাদের সবচেয়ে

নিরাপদ আশ্রয় যে। অজিতের মা এসে তার মমতার স্নেহশীতল হাতটা রাখলো ছেলের মাথায়। এক ঘূর্ণীঝড়ের দমকা হাওয়ায় সবিতার যে সংসার লন্ডভন্ড হয়ে গেছিল আরেক ঘূর্ণীঝড়ের দমকা হাওয়ায় সেই সংসারই আবার জোড়া লাগলো, ভগবানের মর্জি তিনিই জানেন। সবিতা ঠিক করল আর সে তাদের সংসার তরীখানিকে দিগভ্রষ্ট হতে দেবে না কোনো দমকা হাওয়ায়, সে শক্ত হাতে হাল ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনে, শুধু অজিত থাকুক তার পরমাশ্রয় হয়ে সঙ্গে সঙ্গে।

BANGLADARSHAN.COM

॥নিয়মভঙ্গ॥

দেবিকার আজকে সকাল থেকে ভীষণ ব্যস্ততা, আজকে তাদের সপরিবারে নেমন্তন্ন দেবিকার মেসোমশাই স্বর্গীয় দেবকুমার মুখার্জির শ্রাদ্ধের পরে নিয়মভঙ্গের অনুষ্ঠানে। মা বাবা-আগের দিন চলে গেছেন আগরপাড়ায় যেখানে মাসির শ্বশুরবাড়ি। আজকে দেবিকা, বর সঞ্জয়, মেয়ে তিতাস আর বোন দীপশিখা যাবে। বোন দীপশিখার একটা পরীক্ষা ছিল আজকে, তাই সে দিদির সঙ্গে যাবে।

ট্যাক্সি আর ট্রেনে করে বেলা বারোটায় তারা সবাই পৌঁছলো মাসির বাড়িতে।প্রচুর লোকজন, মেরাপ বেঁধে জায়গা ঘিরে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। গঙ্গার ধারে তিনতলা বিশাল বাড়ি, এঁদের বাড়ির এই এলাকায় নাম “ছাতাপড়া মুখুজ্জে বাড়ি”, এঁদের নাকি এতো টাকা ছিল যে টাকায় ছাতা পড়ে গেছিল, সোনাদানার আর টাকার নাকি ছড়াছড়ি ছিল, তাই বাড়ির এমন নাম, বনেদী জমিদার পরিবার, প্রোথিতযশা লোকজন এঁদের পরিবারের মধ্যে আছেন। মাসির বিয়েতে নাকি পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ে দিয়েছিল গয়নায় মাসির শ্বশুর, মাসির বিয়ের ছবিতে আছে মাসি সোনার মুকুট পড়ে বসে আছে, এসব দেবিকা দেখেছে আর শুনেছে ছোট থেকে। মাসির এক ছেলে আর এক মেয়ে, মেয়ে বুলা বড়ো, সে দেবিকার থেকেও বড়ো এগারো বছরের, বিবাহিতা, একটি পুত্রের জননী। খাওয়া দাওয়ার তদারকি করছে মাসির দেওর আর বুলা, মাসির ছেলে রাজা দেবিকার চেয়ে এক বছরের ছোট, সে একটু অন্যরকম, সে ভীষণ নির্লিপ্ত। এলাহী আয়োজন, নিয়মভঙ্গ বা আঁশপান্নার খাওয়া তো নয়, যেন উৎসব। গেটের মুখে কয়েকটা ভিখিরির ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে উঁকি মারছে আর বাড়ির লোকজন তেড়ে যাচ্ছে তাদের দিকে, বাতাসে ভাসছে খাবারের সুগন্ধ। সেগুলো নাক দিয়ে টেনে ভিখিরির বাচ্ছাগুলো বোঝার চেষ্টা করছে কেমন স্বাদ হবে সেসব খাবারের।

পর পর বহুলোক খেয়ে উঠলো তৃপ্তির উদগার তুলতে তুলতে, তাঁদের পরিতৃপ্ত মুখভঙ্গি বলে দিচ্ছে তাঁরা খেয়ে বেশ পরিতোষ পেয়েছেন। ক্রমে বাইরের লোকের পরে বাড়ির লোকেরা বসল, দেবিকা ঠিক করল সে দিদি বুলার সঙ্গে শেষে বসবে। দেবিকার মাবাবা-, বর, মেয়ে, বোন, মাসি, মাসির দেওর, জা, বুলার ছেলে, বর, সবাই বসেছে, মাসির মেয়ে বুলা মায়ের খাবার দিয়েছে সব নিরামিষ পদ দিয়ে আর বাকিদের মাছ, মাংস পোলাও সহ সব আমিষ পদ। দেবিকা পরিবেশন করছে সবাইকে।

দেবিকা জানে ওর মা, মাসি, দিদি এঁরা কেউ মাছ ছাড়া খেতে পারেনা। দেবিকা দেখলো মাসি বসে আছে থালা সামনে নিয়ে, ভাত তরকারি নাড়াচাড়া করছে কিন্তু খাচ্ছে না কিচ্ছুটি। মাসির সুগার আছে, প্রেসার আছে। দেবিকা মাছের ডেকচি থেকে মাছ তুলে মাসির সামনে রাখলো, তারপরে সেগুলো বেছে মাসির থালায় দিল।

মাসি তো লোকলজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছে, মাসির দেওর, জা, মাসির মেয়ে সবাই হা হা করে উঠেছে। দেবিকা মাছটা জোর করে মাসির মুখে গুঁজে দিতে মাসি কেঁদে বলল, "ওরে, আমি যে বামুনের ঘরের বিধবা, আমায় আমিষ খেতে নেই, পাপ হবে।" দেবিকা বলল, "শোনো, যা পাপ হবার আমার হবে, তুমি কি বিয়ের আগে মাছ খেতে না, যে বিধবা হলে মাছ খেতে পারবে না? ওসব ছাড়ো, তোমার শরীরের জন্যই তোমার মাছ খাওয়া উচিৎ, আমি তোমায় খাইয়ে নিয়ম ভাঙলাম, পাপ হলে আমার হবে, আমি বুঝে নেব, তুমি নিশ্চিন্তে সব পাপের দায় আমাকে দিয়ে খাও।" দেবিকার মা বসে ছিলেন মাসির সামনে, তিনি উঠে মেয়েকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন, "আমি যেটা ভাবতে পারিনি, তুই সেটা কি করে করলি রে মা? আমার মনে হয়নি কেন এই কথাটা? আমার গর্ব হচ্ছে এমন মেয়ের মা বলে আমি।" মাসি খেয়ে উঠে ওকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "দেখ, বুলা যেটা করার কথা ভাবেইনি সেটা করলি কি করে তুই এতো ছোট বয়সে? সত্যিই তোর অন্তঃকরণ সবার চেয়ে আলাদা রে মা।" বুলা এসে চোখে জল নিয়ে মাকে আর বোনকে জড়িয়ে ধরল। দেবিকা চুপচাপ শুনলো কিন্তু রাজাকে বলল খেয়াল রাখতে যেন দেখে ওর মা নিয়মিত মাছটুকু খায়।

তারপরে মাসির কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু বলল, মাসি সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন, বুলাকেও বলতে সেও সম্মতি দিল। দেবিকা গেটের সামনে গিয়ে দেখলো কিছু, তারপরে বুলাকে নিয়ে কয়েকটা খাবারের প্লেট বাটি রাখলো খাবারের টেবিলে, তারপর ভিখিরির বাচ্ছাগুলোকে ডাকল, তারা আসতে তাদের পেছনে তাদের মা বাবারাও এসে দাঁড়ালো। বুলাকে নিয়ে দেবিকা পরিবেশন করে খাওয়ালো তাদেরও। খেয়ে ওঠার সময় ওদের মুখে হাসি দেখে দেবিকার মনে হল তার আজকে না খেলেও চলে, ওদের পরিতৃপ্তিটা যেন দেবিকা টের পেল অন্তরে। এইসময় সঞ্জয় আর বুলার বর ওদের দুজনকে জোর করে খেতে বসালো। আসলে দেবিকার মা, মাসি এঁরা লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালোবাসে, সেই ভরসায় মাসির কাছে ওই ভিখিরিদের খাওয়ানোর অনুমতি নিল দেবিকা আর দেবিকার কাণ্ড দেখে বুলা নিজেই এগিয়ে এলো ওকে সাহায্য করতে।

একই কাজ সে করল নিজের শ্বশুর মারা যেতে তার শাশুড়ির সাথে, সেখানেও সে সমর্থন পেল বরের আর নিজের মায়ের। কবেকার চাপিয়ে দেওয়া সংস্কারের বোঝা আজও আমাদের সমাজে মেয়েরা বয়ে চলেছে আর তাতে মদত দিয়ে চলেছে কিছু মেয়েরাই। যত কিছু পালনীয়, বিধিনিষেধ মেনে চলার দায় যেন শুধু মেয়েদেরর, কোনো পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হলে তার জন্য কিন্তু কোনো নিয়ম নেই, বরং কদিন যেতেই তিনি আবার পুনর্বার দারপরিগ্রহ করে নিজের আর সংসারের সুরাহায় ব্রতী হন। সেইসব নিয়মের বাইরে বেরোনোটাই তাই দেবিকার অভিধানে নিয়মভঙ্গ।

॥বঞ্চিতের অতৃপ্তি॥

আজকে শান্তিলতার মানে এবাড়ির বড়োমেয়ের মৃত্যুর শ্রাদ্ধের পরের নিয়মভঙ্গের অনুষ্ঠান। এলাহী আয়োজন করেছে বাড়ির লোকেরা, খাসির মাংস, ভালো চালের ভাত, ফিশ ফ্রাই, চিংড়ির কালিয়া, ভেটকি পাতুরি, দই, মিষ্টি, চাটনি। একপাশে দাঁড়িয়ে শান্তিলতার বোনঝি প্রত্যুষা দেখছে সব, কত লোকজন, যেন উৎসব।অথচ বড়োমাসি আজীবন কাঁচকলা সেদ্ধ, আলুভাতে ভাত খেয়ে গেল মরা পর্যন্ত।

শান্তিলতা প্রত্যুষার বড়মাসী ছিলেন, মারা গেছেন আশি বছর বয়সে, অনেক ভুগে আর বাড়ির লোককে ভুগিয়ে। এটুকু বললে শান্তিলতার জন্য কারোর কোনো সহানুভূতি হবে না। কিন্তু যদি বলি শান্তিলতার নয় বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আর এগারোতেই উনি বিধবা হন বরের ম্যালেরিয়াতে মৃত্যু হলে, তবে হয়তো একটু সহানুভূতি হবে ওঁর জন্য। অ্যান্ডার্সন হাউসের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট দাপুটে দারোগা পুলিনবিহারী ব্যানার্জীর বড়োমেয়ে শান্তিলতা, তারপরে তাঁর আরো তিনবোন আর একভাই। এগারো বছরে বিধবা হতে ‘অপয়া’, ‘অলক্ষ্মী’ অপবাদ নিয়ে ফিরে এলেন তিনি বাপের বাড়িতে শ্বশুরবাড়ি থেকে। মায়ের কাছেও আজীবন একই কথা শুনলেন। ঠাকুমা ছিলেন খুবই আধুনিকমনোস্কা, উদার, তিনি বললেন ছেলে ছেলের বৌকে নাতনির-আবার বিয়ে দিতে, সে তো স্বামী কি, সংসার কি বুঝলোই না, কিন্তু দাপুটে ছেলের বৌ বিয়ে দিলেন না বড়ো মেয়ের, বিয়ে দিলে তাঁর কোলের ছোট ছোট বাচ্ছাগুলোকে কে মানুষ করে দেবে? এগারো বছর থেকে শান্তি একাদশী করল, আতপ চালের পিন্ডি গিললো আজীবন মায়ের মাছভাতের থালার সামনে বসে, সাদা থান পরে ঘুরলো রঙীন কাপড়ে সুসজ্জিতা মায়ের সামনে, মায়ের কিন্তু কোনো বিকার ছিল না তাতে, বরং উঠতে বসতে কথা শোনাতে ছাড়তো না মা। এরমধ্যে পনেরো বছর বয়সে টাইফয়েডের জ্বরের ঘোরে সিঁড়ি থেকে পড়ে শ্রবণ ক্ষমতায় ঘাটতি দেখা দিল শান্তিলতার, “কালা” বলতো সবাই পেছনে। লেখাপড়া করানোরও চেষ্টা করলো না মা, তাহলে অন্তত নিজের একটা জগৎ হত তাঁর।

ধীরে ধীরে অন্য বোনেদের বিয়ে হল, সংসার হল, সন্তান হল। আস্তে আস্তে ভাইঝিরা বড়ো হল, ভাইঝিদেরও বিয়ে হল, সংসার হল, বাচ্ছা হল। ভাইপোর বিয়ে হয়ে তারও বৌ এলো বাড়িতে আর শান্তিলতার স্বভাব খারাপ হল, সে কারুকে দেখতে পারেনা, কারুর সঙ্গে মানাতে পারেনা, সারাক্ষন শুচিবাই তার আর অকারণে ঝগড়া। সবচেয়ে সমস্যা তার ভাইয়ের বৌ আর মায়ের সঙ্গে, কারণ মা ততদিনে বিধবা হয়েছেন কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ তাঁকে খুব যত্ন করে, নানান রকমের নিরামিষ খাবার গরম গরম করে খাওয়ায়, সেবা করে, আর বিধবা ননদকে দিয়ে বাকী সংসারের কাজ করায়।

শান্তিলতার এই জায়গাটায় খুব রাগ হয়, তাঁর আবার বিয়ে দিলে সেও তো ছেলের বা মেয়ের মা হত, তারও সংসার হত, ভাইয়ের সংসারে আশ্রিত তাকে হতে হত না, মায়ের ওপরে গিয়ে সব রাগটা পড়ে তার। এরমধ্যে বয়স বাড়তে তাকেও রোগে ধরল আর ধরল লোভে, কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে আমিষ খাবার তার দেখাও বারণ। তাই সে কারুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে পারে না, নিজের বঞ্চিতের জীবনটা তাকে যেন দাঁত বের করে উপহাস করে। প্রত্যুষা তার বোনের মেয়ে। প্রত্যুষা তার কাছে বিশেষ ঘেঁষে না বটে কিন্তু তাকে এড়িয়েও চলে না, তাই তার প্রতি শান্তিলতার কেমন এক অব্যক্ত বাৎসল্য ছিল। প্রত্যুষা আসলে তাকে নাড়ুটা, নিমকিটা, খাজাটা, নিজের ভাগের এক আধটা মিষ্টি সে হাতে দিয়ে কাছে টেনে বসায়, এটা সেটা জিজ্ঞাসা করে, মোটকথা বিরক্ত হয় না।

তারপরে শান্তিলতা বিছানায় পড়লেন অসুস্থ হয়ে, ভীষণ ভুগলেন বেশ কয়েক বছর, তার আগে তার মা বাবা চলে গেছেন ওপারে। পরিশেষে এই কিছুদিন আগে তিনিও গেলেন। ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছে প্রত্যুষা এমন সময় হঠাৎ প্রত্যুষা দেখলো শান্তিলতার নিজের ভাইপো আর প্রত্যুষার মামাতো দাদা তাকে ডাকছে খেতে খাওয়ার জায়গায়, সে গিয়ে বসল দাদার পাশে ।দাদার সঙ্গে তার ভালোই সখ্যতা। প্রত্যুষাকে দাদা শিবু বলল, “দেখ, সারাজীবন তো কিছুই পেল না বড়োপিসি, তাই নিয়ম ভঙ্গে সব করেছি যাতে ওঁর কোনো অতৃপ্তি না থাকে।” বলে একবালতি মাংস টেনে নিল দাদা নিজের খাওয়ার জন্য আর আজীবন বঞ্চিত বড়মাসী শান্তিলতার জন্য বুকের মধ্যে হু হু করে উঠলো প্রত্যুষার, সে কিছুই খেতে পারলো না বড়মাসির বঞ্চিতের অতৃপ্তিটা মনে করে। বার বার মনে হতে লাগলো প্রত্যুষার এই সহানুভুতি দাদা বড়মাসী বেঁচে থাকতে দেখিয়ে তাঁকে একটু তাঁর যা যা খেতে ইচ্ছে করত সেগুলো যদি খাওয়াতো প্রত্যুষার আর খাওয়া !!! হল না, সে ঢকঢক করে জল খেয়ে উঠে পড়লো খাওয়ার জায়গা থেকে।

॥ওগো আমার প্রিয়॥

অবশেষে হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়ার পরে বিরস মুখে মায়ের সামনের বার্থটার জানলার ধারে এসে বসল অভিজিৎ অন্তরাকে 'বাই' করে ডিসেম্বরের এক সকালে। নিজের চেনা শহর, পাড়া, চেনা পরিমণ্ডল, পরিবেশ, বন্ধুদের ছেড়ে চলল অভিজিৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ডাকে। নাঃ...শেষ পর্যন্ত এলো না তৃষিতা!!! খুবই আশা করেছিল অভিজিৎ শেষ মুহূর্তে হয়তো তৃষিতা আসবে...তার মানে ভালোবাসা, আবেগ সবই ওর একতরফা ছিল? নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিল ওর মানুষকে ভুল চেনার জন্য, আজও ও সত্যিই মানুষ চেনে না, আবেগ নিয়েই চলে। মা সুনন্দা একদৃষ্টে ছেলেকে লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষন, এবারে বাইরে মন দিলেন। এসি টু টায়ার কোচে দিল্লি চলেছে মা সুনন্দা, বাবা অজিতেশ আর ছেলে অভিজিৎ।

অভিজিতদের নিজেদের সোনার বড়ো দোকান আছে নিউ আলিপুরে বাড়ির লাগোয়া। অজিতেশ দেখেন সেটা, বেশ সচ্ছল পরিবার তাদের, কিন্তু সুনন্দা আর অজিতেশ দুজনেই স্বনির্ভরতায় বিশ্বাসী, তাই ছেলেকে তার মনের মত বাড়তে দিয়েছেন। অভিজিৎ বাবা মায়ের একটু বেশী বয়সের একমাত্র সন্তান, তাই সে যেমন তার মা বাবার চোখের মণি, তেমনি অভিজিতেরও মা অন্তপ্রাণ। সুনন্দা এমনিতে খুবই কর্মঠ আর মিশুকে স্বভাবের মানুষ বটে, কিন্তু তাঁকে কাবু করে দিয়েছে ব্লাডসুগার। একে তো তাঁর সত্তরের কাছে বয়স, তায় এই সুগার আর তার সঙ্গে তাঁর অসম্ভব মিষ্টিপ্রীতি। তাই মাঝে মাঝেই তিনি অসুস্থ হন আর অসুস্থ হলে বহুদিন ধরে তাঁর ভোগান্তি চলে। একবার তো চোখ তাঁর প্রায় চলেই গেছিল, বহুদিন নিয়ম মেনে চলে অবশেষে একটু ভালো আছেন। অভিজিৎ কমার্স নিয়ে পড়ে এম বি এ করে একটা ভালো জায়গায় চাকরি করছে কয়েক বছর। সেখানেই তার আলাপ তৃষিতার সঙ্গে যেটা আস্তে আস্তে প্রণয়ে রূপ নিয়েছিল।

সুনন্দার খুব উৎসাহ এইসব ব্যাপারে, তিনি ছেলের মা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ছেলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও বটে। অভিজিতেরও তাই মাকে সারাদিনের সব কথা না বললে পেটের ভাত হজম হয় না। তাই অভিজিতের বন্ধুদের কাছেও সুনন্দার খুবই গ্রহণযোগ্যতা, তারাও আন্টি বলতে অজ্ঞান, সুনন্দা খুবই আধুনিকমনস্কা, যুক্তিবাদী, নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মহিলা। সেই জন্যই তৃষিতার ব্যাপারে জানতে পেরে তৃষিতাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে রান্না করেছিলেন তৃষিতার পছন্দের পদ।

কিন্তু তৃষিতা অভিজিতের এহেন মাতৃভক্তি দেখে প্রথমে সুনন্দার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলল না, তাঁর নানান খুঁত ধরতে লাগলো। এতো বয়স্ক একজন মানুষ তাদের দুজনের মাঝখানে থাকবে, তার হবু বর তাঁর কথার গুরুত্ব দেবে এতো-এই ব্যাপারটা মেনে নিতে তার প্রবল আপত্তি। তার সাফ কথা, "হয় আমাকে নিয়ে থাকো,

নয় মাকে।” অভিজিৎ তৃষিতাকে ভালোবাসলেও অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে ছাড়ার কথা ভাবতেই পারে না। তাই নিয়ে দুজনের মনোমালিন্য চলছিল, অভিজিৎ অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিল তৃষিতাকে, কিন্তু সে কোনো ভাবেই সুনন্দাকে মেনে নিয়ে সম্পর্ক এগোতে রাজী নয়। এমন সময় কোম্পানি অভিজিৎকে তাঁদের ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দিল্লীতে বদলি করল।

অভিজিৎ যাবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করতে দেখা করেছিল তৃষিতার সঙ্গে, তার আগে সুনন্দা অনেক বুঝিয়েছিল অভিজিতকে যে সত্যিই তো আসলে তো জীবনটা তাদের দুজনের, সেখানে মাতো তৃতীয় ব্যক্তি, কিন্তু অভিজিৎ মাকে বাদ দিয়ে নিজের জীবন ভাবতেই পারেনা, বিশেষত যখন সে একমাত্র সন্তান মা বাপের। শেষে অভিজিৎ রেগে গিয়ে তৃষিতার সঙ্গে দেখা করে বলেই এসেছে যে তার জীবনে আসতে গেলে তৃষিতাকে, মা সুনন্দাকে সঙ্গে ধরেই আসতে হবে, নচেৎ দরকার নেই ভবিষ্যতের সম্পর্কে এগোনোর। তৃষিতা আর কোনো উত্তর দেয় নি, চলে গেছে। আজকে কলকাতা ছাড়ার সময় অভিজিৎ ভেবেছিল তৃষিতা হয়তো আসবে স্টেশনে দেখা করতে কারণ আজকে যে অভিজিৎ চলে যাচ্ছে সেটা তৃষিতা জানে যেহেতু তাদের একই অফিস। কিন্তু ট্রেন চলতে আরম্ভ করল, অন্তরা হাত নেড়ে চলে গেল আর তৃষিতাও এলো না দেখে ভীষণ হতাশ হয়ে এসে বসল নিজের সিটে অভিজিৎ। সুনন্দা আর অজিতেশ দুজনেই দেখলেন সেটা। আসলে দিল্লীতে গিয়ে সুনন্দা অভিজিতের থাকার ব্যবস্থা করে ওকে সেটল করে দিয়ে অজিতেশ চলে আসবেন, সুনন্দা থাকবেন অভিজিতের সঙ্গে কিছুদিন। অভিজিতের আরেক বন্ধু অন্তরার সঙ্গে অভিজিৎ আর সুনন্দার খুব ভালো সম্পর্ক, অন্তরাকে সুনন্দা খুব ভালোবাসেন ওর স্বচ্ছ মন আর উদার স্বভাবের জন্য আর অভিজিতেরও খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু অন্তরা, অন্তরা তাই এই পুরো ঘটনাটাই জানে, সেও কিন্তু অভিজিতের পক্ষে। তৃষিতা থাকে অন্তরার পাড়ায়, অন্তরার থেকে তৃষিতা বছর খানেকের বড়ো কিন্তু এক পাড়ার বাসিন্দা বলে পাড়ার বন্ধু। কিন্তু তৃষিতা জানে না অন্তরা অভিজিতের বন্ধু যদিও অন্তরা অভিজিতের চেয়ে তিন বছরের জুনিয়র কিন্তু একই স্কুল ছিল ওদের আর দুজনেই নানান স্কুল ইভেন্টে পার্টিসিপেট করত বলে খুবই বন্ধু ওরা, তাছাড়া ওরা একই টিউশনে পড়েছে কয়েক বছর।

অন্তরা গেছিল অভিজিতদের সবাইকে ট্রেনে সি অফ করতে, আবার কবে দেখা হবে আন্টি আর অভিজিতের সঙ্গে সেটা ভেবে। রাজধানী এক্সপ্রেস ছেড়ে যেতে ও বাড়ি ফেরার জন্য হাঁটছে যখন তখন ওর চোখে পড়লো তৃষিতাকে, চোখের জল মুছতে মুছতে ও বেরোচ্ছে, মুখটা ভীষণ শুকনো। অন্তরা বুঝলো অভিজিৎকে দেখতেই এসেছিল তৃষিতা কিন্তু জেদের বশবর্তী হয়ে সামনে যায়নি আর এতক্ষনে পরিষ্কার হল অন্তরার কাছে বারবার স্টেশনে কাকে খুঁজে চলেছিল অভিজিতের দুচোখ। অন্তরা গিয়ে তৃষিতার হাতটা ধরতে চমকে উঠল প্রথমে তৃষিতা, তারপরে জিজ্ঞেস করল এখানে কেন এখন অন্তরা। অন্তরা স্বাভাবিক ভাবেই বলল বন্ধুকে সি অফ করার কথা আর ওকে জিজ্ঞেস করল ওকে এত আপসেট লাগছে কেন, বলতেই তৃষিতা ঝরঝর করে কেঁদে

ফেলল অভিজিতের কথা বলতে বলতে। এবারে অন্তরা জিজ্ঞেস করল যে তৃষিতা যদি ভালোই বাসে অভিজিৎকে তো সমস্যাটা কোথায়। ট্যাক্সিতে ফিরতে ফিরতে দুজনে তৃষিতা অভিজিতের মায়ের কথা বলতে অন্তরা শুনলো আর আন্টির সম্পর্কে ওর ধারণাটাও বলল। এটাও বলল আন্টি খুবই সহমর্মী, আধুনিকমনস্ক ও আন্তরিক মানুষ যিনি আক্ষরিক অর্থে অভিজিতকে মরাল সাপোর্ট দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। তাছাড়া আন্টি যে এখনো তৃষিতার হয়েই অভিজিতকে বুঝিয়ে চলেছেন সেটা বলল অন্তরা। অন্তরা যে অভিজিতের ছোটবেলার বন্ধু সেটা তৃষিতা জানতো না।

কাল থেকে তিনদিন ছুটি অফিসে, আজকে তাই কাজের খুব প্রেসার অফিসে অভিজিতের, একে ফিনান্সিয়াল ইয়ার এন্ডিং, তায় এই সময় হোলির জন্য ছুটি থাকবে অফিস, তাই আজকে অভিজিতের বেরোতে বেশ রাত হল। অবশ্য চিন্তা নেই, ও যেখানে বাড়ি নিয়েছে সেটা অফিস থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। পুরোনো দিল্লীর এই দিকে বাড়ি ভাড়াটা একটু কম, বাড়িটা একদম বাজারের মধ্যে এটাই যা অসুবিধে, তাছাড়া কোনো সমস্যা নেই, সবই নাগালের মধ্যে। তাই সাড়ে দশটায় বেরিয়ে কিছু স্নাক্স কিনল বাড়ির জন্য অভিজিৎ। কালকে দোল, মা পুজো করবে, তাছাড়া প্রতিবেশীরাও ভেট পাঠাবে, তাই কিছু কাজু বরফি, লাড্ডু আর শোনপাঁপড়ি কিনল। এসব কিনতে কিনতে মনে পড়লো অভিজিতের তৃষিতা কাজু বরফি আর শোনপাঁপড়ি খুব পছন্দ করে। ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো ওর, এসব এখন অতীত।

BANGLADARSHAN.COM

সেসব নিয়ে ফুল কিনে বাড়ি এসে বেল দিতে যে দরজা খুললো তাকে দেখে ওর হাতের জিনিস সমেত অভিজিৎ পড়েই যাচ্ছিলো। দরজা খুললো এসে অন্তরা। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে অন্তরাকে দেখে নিজের আনন্দ আর চেপে রাখতে পারলো না, ওকে ধরে একপাক ঘুরে নিল দরজার সামনে, তারপর একরকম ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখে মা হাসিমুখে বসে আছে টেবিলে নানান খাবার সাজিয়ে। অন্তরা এসেছে অভিজিতের বাবার সঙ্গে, নিয়ে এসেছে কলকাতার থেকে মিষ্টি, মিষ্টি দই আরো কত কিছু আর বাঙ্গালী নিমকি। দেখেই পেটুক অভিজিৎ একমুঠো যেই হাতে নিয়েছে মা সুনন্দা বললেন, “আগে চেঞ্জ করে তবে খাবি, যা ঘরে যা তোর।” বলে ওর ঘরে ওকে একরকম জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকে ঘরের আলো জ্বালতে দেখে ঘরে বসে আছে তৃষিতা, অভিজিৎ চোখটা কচলে নিল ঠিক দেখছে তো ও। অভিজিতকে দেখে তৃষিতা সামনে এসে বলল, “পারবে আমায় ক্ষমা করে তোমার মনের রঙ্গে আমায় রাঙিয়ে নিতে? আমি যে সব দ্বিধা সংকোচ ভুলে শুধু তোমার জন্য এতদূর ছুটে এসেছি আন্টির কথায় অফিসে বদলি নিয়ে !!!” “আন্টির কথায়” শুনে অভিজিৎ অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকাতে দেখে সুনন্দা দাঁড়িয়ে হাসছেন। “Thou too Brutas!!!” ধরণের একটা চাহনি দিল অভিজিৎ সুনন্দাকে, যে তাকে অন্ধকারে রেখে এই কলকাঠি নেড়েছেন ঘরে বসে বসে অন্তরার সাহায্যে। হঠাৎ প্রাপ্তির এই আনন্দে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না ও।

অন্তরার সঙ্গে যোগাযোগ বরাবরই আছে সুনন্দার আর অভিজিতের, কিন্তু অন্তরা ওর তৃষিতার সঙ্গে যোগাযোগ আর আন্টির সঙ্গে কথাবার্তা কিচ্ছুটি জানায়নি অভিজিতকে। সেই অন্তরার মধ্যস্থতায় তিনি একটু ঝুঁকি নিয়েই শৈশবে মাতৃহীন তৃষিতাকে আসতে বলেছেন আর তৃষিতা বুঝেছে সুনন্দার মত মানুষের সঙ্গ তাকে সাহায্যই করবে ভবিষ্যতে যত সুনন্দার সঙ্গে ওর যোগাযোগ বেড়েছে। তাই সেও এখন সুনন্দার সঙ্গই চায়, একটা স্নেহের মায়ের আঁচল চায় নিশ্চিত আশ্রয়ের। তাই ও এখন দাঁড়িয়ে আছে সুনন্দাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। বাবাও এসেছেন কখন ঘরে ছেলের ভবিষ্যতের রাস্তা সুগম করতে।

হঠাৎ অন্তরা গান ধরল, “আজ সবার রঙ্গে রং মেশাতে হবে, ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙীন উত্তরীয়” সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা আর তৃষিতাও গলা মেলালো। অভিজিৎ বলল, “না না, আমি আজ গাইবো” এমন মাধবী নিশি আসেনি তো আগে বলে অভিজিৎ একপাক নেচে নিল অন্তরা আর তৃষিতার হাত ধরে। অভিজিতের মনে হল আজকে ও পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ যাকে ঈশ্বর একসঙ্গে মনের মানুষ, চির সহযোগী মা বাবা আর অন্তরার মত রত্ন একটা বন্ধু দিয়ে রঙীন করে দিয়েছেন জীবন সব উজ্জ্বল রঙ্গে। এবারে বসন্তে তাই কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, অশোকের লাল হলুদের সঙ্গে সব ফিরোজা, সবুজ, নীল রঙ মিশে এক অনির্বচনীয় আবীর রঙ্গে রেঙে হয়ে উঠেছে যেন প্রাণের হোলি।

BANGLADARSHAN.COM

॥ভবিষ্যৎ কর্ণধার॥

জাপানে সুজোকিরি কোম্পানি বেশ বড়ো সংস্থা, নানা ধরণের ব্যবসার সঙ্গে তারা যুক্ত। তাদের চেয়ারম্যান তথা কর্ণধার শ্রীফুজিয়ামার বেশ বয়স হয়েছে, তিনি ঠিক করেছেন তিনি এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্ণধার নির্বাচন করবেন। সেই কাজের জন্য উনি জাপানের বিভিন্ন অফিসের পাঁচজন সর্বোচ্চ অধিকারিককে ডেকে পাঠালেন, প্রত্যেকেই তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের কর্মের উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেন। চেয়ারম্যানের চেম্বারে মিটিং হল এবং মিটিং শেষ হবার পরে তিনি প্রত্যেক অধিকারিককে একটা করে শিমের দানা দিলেন আর বললেন দুমাস পরে আবার তিনি সবাইকে ডাকবেন এই শিমের দানা সমেত, এই দুমাসে তিনি দেখবেন এই দানা কার হাতে কেমন বেড়েছে।

পাঁচজন আধিকারিক শিমের দানা নিয়ে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন, সাধ্যমতো যত্ন করতে লাগলেন। সপ্পোরোর আধিকারিক শ্রীমিশোমার খুব অবস্থা খারাপ, তাঁর শিমের বীজটা অনেক কায়দা করেও কোনো অঙ্কুরোদ্গম হয়নি,গাছ তো অনেক দূরের ব্যাপার। তিনি বহু চেষ্টা করলেন, তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কিছুতেই গাছ বেরোলো না, ওদিকে আর চার অধিকারিকদের কারো এক ফুটে গাছ হয়েছে, কারো ছয় ইঞ্চির, কারো তিন ইঞ্চির আর একজনের খালি সদ্য কয়েকটা পাতা গজিয়েছে। এদিকে দেখতে দেখতে দুমাস অতিক্রান্ত, সবাই পৌঁছলো ওসাকার হেড অফিসে সঙ্গে করে নিজের নিজের বড়ো হওয়া গাছ নিয়ে। কেবল শ্রীমিশোমার বীজের কোনো গাছ হয়নি, তিনি বীজটা পকেটে করে নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে তাঁর রেসিগ্নেশন লেটার। তিনি নিশ্চিত তাঁর চাকরিটি থাকছে না।

শ্রীফুজিয়ামা ঢুকলেন চেয়ারম্যানের চেম্বারে, সবাই দেখলো পাঁচটা চেয়ার পাতা আছে, যার শেষটা একদম টেবিলে মাথায়, অর্থাৎ ওটাই ভবিষ্যতের কর্ণধারের আসন আর বাকিগুলো তাঁর সহযোগীদের। একে একে সবাইয়ের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে এবারে তিনি দেখতে চাইলেন কার দানা থেকে কেমন গাছ হয়েছে এবং সেটা কত বড়ো হয়েছে। প্রথম তিনি গেলেন যাঁর গাছটা একফুটের বেশী লম্বা, শ্রীফুজিয়ামা গাছ দেখে মাথা নাড়লেন সম্মতিসূচক আর তাঁকে সহযোগীদের একদম শেষের পঞ্চম চেয়ারে গিয়ে বসতে বললেন। তিনি তাই করলেন। এবারে এগিয়ে গেলেন তিনি যাঁর গাছ নয় ইঞ্চি হয়েছে, তাঁকে উনি চতুর্থ চেয়ারে বসতে বললেন। এবারে গেলেন তিনি যাঁর গাছটা ছয় ইঞ্চি হয়েছে, তাঁকে তৃতীয় চেয়ারে বসালেন, তারপরে গেলেন তিনি যাঁর গাছটা তিন ইঞ্চি হয়েছে আর দুটো মাত্র পাতা বেরিয়েছে, তাঁকে উনি দ্বিতীয় চেয়ারে বসতে বললেন।

শ্রীমিশোমার অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিলেন কিছু বলার জন্য, কিন্তু বলতে পারেননি একবার তিনি

ভাবলেন বেরিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু অন্য অধিকারিকদের ওই প্রক্রিয়াটা চলাকালীন বেরিয়ে যাওয়াটা শিষ্টাচার বিরোধী, তাই বেরোননি। এবারে তাঁর সময় আসতে তিনি পকেট থেকে বীজটা বের করে টেবিলে রাখলেন এবং তাঁর হাতে যে ওই শিমদানা থেকে কোনো গাছ হয়নি বললেন। তারপরে তিনি তাঁর রেসিগ্নেশন লেটারটা বের করেছেন দেবেন বলে এমন সময় শ্রীফুজিয়ামা শ্রীমিশোমারকে বললেন ওই প্রধান কর্ণধারের চেয়ারটায় গিয়ে বসতে। সবাই অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

মৃদু হেসে শ্রীফুজিয়ামা বললেন, “তোমাদের সবাইকেই আমি দানা দিয়েছিলাম কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের বলিনি যে ওই দানাগুলো সেদ্ধ শিমের দানা যার থেকে গাছ হবার সম্ভাবনা নেই। তোমরা না জেনে চেষ্টা করেছো ওই দানা থেকে গাছ হওয়াতে এবং গাছ বের না হতে অন্য শিমের দানা পরিচর্যা করে গাছ বের করে নিয়ে এসেছো এখানে, যে যত তাড়াতাড়ি অন্য শিমের দানা পুঁতেছে তার ততো বড়ো গাছ হয়েছে। একমাত্র শ্রীমিশোমার সেসব কিছু না করে সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে এসেছে সেই পুরোনো দানাটা নিয়ে। কোম্পানির যে ভবিষ্যৎ কর্ণধার হবে তাঁর প্রথম গুণ থাকা দরকার সততা ও উদ্যোম, শ্রীমিশোমারের সেই সততা আছে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আর সেই উদ্যোম আছে কারণ সে চেষ্টা করেছিল ওই বীজ থেকে গাছ হওয়াতে এবং সেটা না হওয়াতে সে নিজের পদত্যাগপত্র লিখে এনেছে যাতে তাঁর অপারগতায় কোম্পানির ক্ষতি না হয়। এতে তাঁর কোম্পানির প্রতি দায়বদ্ধতা প্রমাণ হয়। তোমরা প্রত্যেকে এর বিকল্প ভেবেছো এবং তার জন্য অন্য বীজ থেকে গাছ তৈরী করে এনেছো যেটা কোম্পানির বিকল্প ব্যবসার রাস্তা দেখাবে। তাই আমি শ্রীমিশোমারকে এই কোম্পানির কর্ণধার নির্বাচন করলাম আর তোমাদের তাঁর যোগ্য সহযোগী। আশা করি তোমাদের আমার এই সিদ্ধান্তে কোনো দ্বিমত নেই।” সবাই উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীফুজিয়ামার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে শ্রীমিশোমারকে নতুন কর্ণধার হিসেবে স্বাগত জানালো।

॥সমাপ্ত॥